আর রূম

৩০

নামকরণ

প্রথম আয়াত غُلِبَتِ الرُّوْمُ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে নাযিলের সময়–কাল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, "নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।" সে সময় আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিল জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন। এসব এলাকায় রোমানদের ওপর ইরানীদের বিজয় ৬১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটি সে বছরই নাযিল হয় এবং হাবশায় হিজরাতও এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা কুরআন মজীদের আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য রসূল হবার সুস্পষ্ট প্রমাণগুলোর অন্যতম। এটি অনুধাবন করার জন্য এ আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের ৮ বছর আগের একটি ঘটনা। রোমের কায়সার মরিসের (Mauric) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ফোকাস (Phocas) নামক এক ব্যক্তি রাজ সিংহাসন দখল করে। সে প্রথমে কায়সারের চোখের সামনে তাঁর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করায় তারপর নিজে কায়সারকে হত্যা করে পিতা ও পুত্রদের কর্তিত মস্তকগুলো কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রকাশ্য রাজপথে টাঙিয়ে দেয়। এর কয়েকদিন পর সে কায়সারের স্ত্রী ও তার তিন কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার ফলে ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজ রোম আক্রমণ করার চমৎকার নৈতিক ওজুহাত খুঁজে পান। কায়সার মরিস ছিলেন তাঁর অনুগ্রাহক। তাঁর সহায়তায় পারভেজ ইরানের সিংহাসন দখল করেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের পিতা বলতেন। এ কারণে তিনি ঘোষণা করেন, বিশ্বাসঘাতক ফোকাস আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যে জুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ নেবো। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে ফোকাসের সেনাবাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরের

এডেসার (বর্তমান উরফা) এবং অন্যদিকে সিরিয়ার হাল্‌ব ও আন্তাকিয়ায় পৌঁছে যান। রোমের রাজ পরিষদ যখন দেখলো ফোকাস দেশ রক্ষা করতে পারছে না তখন তারা আফ্রিকার গবর্নরের সাহায্য চাইলো। গবর্নর তার পুত্র হিরাক্লিয়াসকে (Heraclius) একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী সহকারে কনষ্টান্টিনোপলে পাঠান। তার সেখানে পৌঁছে যাবার সাথে সাথেই ফোকাসকে পদচ্যুত করা হয়। তার পরিবর্তে হিরাক্লিয়াসকে কায়সার পদে অভিসিক্ত করা হয়। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাসের সাথে একই ব্যবহার করেন যা সে ইতিপূর্বে মরিসের সাথে করেছিল। এটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং এ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাবাজীর ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ফোকাসের পদচ্যুতি ও তার হত্যার পর তা খতম হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ফোকাসের থেকে তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতো তাহলে তার নিহত হবার পর নতুন কায়সারের সাথে পারভেজের সন্ধি করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এরপরও যুদ্ধ জারী রাখেন। বরং এরপর তিনি এ যুদ্ধকে অগ্নি উপাসক ও খৃষ্টবাদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ দেন। খৃষ্টানদের যেসব সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত ও নাস্তিক গণ্য করে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় গীর্জা বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল (অর্থাৎ নাস্তুরী, ইয়াকূবী ইত্যাদি) তারাও আক্রমণকারী অগ্নি উপাসকদের প্রতি সর্বাত্মক সহানুভূতি দেখাতে থাকে। এদিকে ইহুদিরাও অগ্নি উপাসকদেরকে সমর্থন দেয়। এমন কি খসরু পারভেজের সেনাবাহিনীতে অংশ গ্রহণকারী ইহুদী সৈন্যদের সংখ্যা ২৬ হাজারে পৌঁছে যায়।

হিরাক্লিয়াস এসে এ বাঁধ ভাংগা স্রোত রোধ করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই পূর্বদেশ থেকে প্রথম যে খবরটি তাঁর কাছে পৌঁছে সেটি ছিল ইরানীদের হাতে আন্তাকিয়ার পতন। তারপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তারা দামেশক দখল করে। ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিস দখল করে ইরানীরা সমগ্র খৃষ্টান জগতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ৯০ হাজার খৃষ্টানকে এই শহরে হত্যা করা হয়। তাদের সবচেয়ে পবিত্র আল কিয়ামাহ গীর্জা (Holy Sepulchre) ধ্বংস করে দেয়া হয়। আসল ক্রুশ দণ্ডটি, যে সম্পর্কে খৃষ্টানদের বিশ্বাস হযরত মসীহকে তাতেই শূলীবিদ্ধ করা হয়েছিল, ইরানীরা ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েন পৌঁছিয়ে দেয়। আর্চবিশপ যাকারিয়াকেও পাকড়াও করা হয় এবং শহরের সমস্ত বড় বড় গীর্জা তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খসরু পারভেজ বিজয়ের নেশায় যেভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তা বায়তুল মাকদিস থেকে হিরাক্লিয়াসকে তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন তা থেকে আন্দাজ করা যায়। তাতে তিনি বলেন ঃ

"সকল খোদার বড় খোদা, সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী খসরুর পক্ষ থেকে তার নীচ ও মূর্খ অজ্ঞ বান্দা হিরাক্লিয়াসের নামে—

"তুমি বলে থাকো, তোমার খোদার প্রতি তোমার আস্থা আছে। তোমার খোদা আমার হাত থেকে জেরুশালেম রক্ষা করলেন না কেন?"

এ বিজয়ের পর এক বছরের মধ্যে ইরানী সেনাদল জর্দান, ফিলিস্তীন ও সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে পারশ্য সাম্রাজ্যের সীমানা মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। এটা এমন এক

সময় ছিল যখন মক্কা মু'আয্যমায় এর চাইতে আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছিল। এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীনে তাওহীদের পতাকাবাহীরা কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্বে শিরকের পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে স্বদেশ ত্যাগ করে হাবশার খৃষ্টান রাজ্যে (রোম সাম্রাজ্যের মিত্র দেশ) আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে ইরানের বিজয় অভিযানের কথা ছিল সবার মুখেমুখে, মক্কার মুশরিকরা এসব কথায় আহলাদে আটখানা হয়ে উঠছিল। তারা মুসলমানদের বলতো, দেখো, ইরানের অগ্নি উপাসকরা বিজয়লাভ করেছে এবং অহী ও নবুওয়াত অনুসারী খৃষ্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে চলছে। অনুরূপভাবে আমরা আরবের মূর্তিপূজারীরাও তোমাদেরকে এবং তোমাদের দীনকে ধ্বংস করে ছাড়বো।

এ অবস্থায় কুরআন মজীদের এ সূরাটি নাযিল হয় এবং এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় ঃ "নিকটবর্তী দেশে রোমানরা পরাজিত হয়েছে কিন্তু এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই আবার তারা বিজয়ী হবে। আর সেটি এমন দিন হবে যেদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে মু'মিনরা খুশী হয়ে যাবে।" এর মধ্যে একটির পরিবর্তে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, রোমানরা জয় লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুসলমানরাও একই সময় বিজয় লাভ করবে। আপাতদৃষ্টে এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর কোন একটিরও কয়েক বছরের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হবার কোন দূরতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান। তারা মক্কায় নির্যাতিত হয়ে চলছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বছর পর্যন্ত কোনদিক থেকে তাদের বিজয় লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে রোমের পরাজয়ের বহর দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। ৬১৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র মিশর পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। অগ্নি উপাসক সেনাদল ত্রিপোলির সন্নিকটে পৌছে তাদের পতাকা গেঁড়ে দিয়েছিল। এশিয়া মাইনরে ইরানী সেনাদল রোমানদের বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত করতে করতে বসফোরাস প্রণালীতে পৌছে গিয়েছিল ৬১৭ সালে তারা কনস্ট্যান্টিনোপলের সামনে খিলৃকদুন (Chalcedon : বর্তমান কাযীকোই) দখল করে নিয়েছিল। কায়সার খসরুর কাছে দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও দীনতা সহকারে আবেদন করলেন, আমি যে কোন মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, "এখন আমি কায়সারকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা দেবো না যতক্ষণ না তিনি শৃংখলিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির হন এবং তাঁর শূলীবিদ্ধ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অগ্নি খোদার উপাসনা করেন।" অবশেষে কায়সার এমনই পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন হয়ে পড়লেন যে, তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজে (Carthage : বর্তমান টিউনিস) চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। মোটকথা ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবনের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বছর পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল যার ফলে রোমানরা ইরানীদের ওপর বিজয় লাভ করবে এ ধরনের কোন কথা কোন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারতো না। বরং বিজয় তো দূরের কথা তখন সামনের দিকে এ সাম্রাজ্য আর টিকে থাকবে এ আশাও কারো ছিল না।*

* Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol. ii. P. 788, Modern Library, New York.

কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল হলে মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুবই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। উবাই ইবনে খাল্‌ফ হযরত আবু বকরের (রা) সাথে বাজী রাখে। সে বলে, যদি তিন বছরের মধ্যে রোমানরা জয়লাভ করে তাহলে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো অন্যথায় তুমি আমাকে দশটা উট দেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাজীর কথা জানতে পেরে বলেন, কুরআনে বলা হয়েছে فِى بِضْعِ سِنِيْنَ আর আরবী ভাষায় بِضْعِ শব্দ বললে দশের কম বুঝায়। কাজেই দশ বছরের শর্ত রাখো এবং উটের সংখ্যা দশ থেকে বাড়িয়ে একশো করে দাও। তাই হযরত আবু বকর (রা) উবাইর সাথে আবার কথা বলেন এবং নতুনভাবে শর্ত লাগানো হয় যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সে অন্যপক্ষকে একশোটি উট দেবে।

৬২২ সালে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরাত করে মদীনা তাইয়েবায় চলে যান অন্যদিকে কায়সার হিরাক্লিয়াস নীরবে কষ্ট্যান্টিনোপল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণসাগরের পথে ত্রাবিজুনের দিকে রওয়ানা দেন। সেখানে গিয়ে তিনি পেছন দিক থেকে ইরানের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই প্রতি–আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কায়সার গীর্জার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে খৃষ্টীয় গীর্জার প্রধান বিশপ সারজিয়াস((Sergius) খৃষ্টবাদকে মাজুসীবাদের (অগ্নিপূজা) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গীর্জাসমূহে ভক্তদের নজরানা বাবদ প্রদত্ত অর্থ সম্পদ সূদের ভিত্তিতে ঋণ দেন। হিরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়া থেকে নিজের আক্রমণ শুরু করেন। দ্বিতীয় বছর ৬২৪ সালে তিনি আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুষ্ট্রের জন্মস্থান আরমিয়াহ (Clorumia) ধ্বংস করেন এবং ইরানীদের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন। আল্লাহর মহিমা দেখুন, এই বছরেই মুসলমানরা বদর নামক স্থানে মুশরিকদের মোকাবিলায় প্রথম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। এভাবে সূরা রূমে উল্লেখিত দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই দশ বছরের সময়সীমা শেষ হবার আগেই একই সংগে সত্য প্রমাণিত হয়।

এরপর রোমান সৈন্যরা অনবরত ইরানীদেরকে পর্যুদস্ত করে যেতেই থাকে। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে নিনেভার যুদ্ধে তারা পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। এরপর পারস্য সম্রাটদের আবাসস্থল বিধ্বস্ত করে। হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তারা তদানীন্তন ইরানের রাজধানী তায়াসফুনের (Ctesiphon) দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। ৬২৮ সালে খসরু পারভেজের পরিবারে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাকে বন্দী করা হয়। তার চোখের সামনে তার ১৮ জন পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। কয়েক দিন পরে কারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাকে কুরআন মহা বিজয় নামে আখ্যায়িত করেছে এবং এ বছরই খসরুর পুত্র দ্বিতীয় কুবাদ সমস্ত রোম অধিকৃত এলাকার ওপর থেকে অধিকার ত্যাগ করে এবং আসল ক্রুশ ফিরিয়ে দিয়ে রোমের সাথে সন্ধি করে। ৬২৯ সালে "পবিত্র ক্রুশ"কে স্বস্থানে স্থাপন করার জন্য কায়সার নিজে "বায়তুল মাকদিস" যান এবং এ বছরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযা উমরাহ আদায় করার জন্য হিজরাতের পর প্রথম বার মক্কা মু'আযযমায় প্রবেশ করেন।

এ পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যে, পুরোপুরি সত্য ছিল এ ব্যাপারে কারো সামান্যতম সন্দেহের অবকাশই ছিল না। আরবের বিপুল সংখ্যক মুশরিক এর প্রতি ঈমান আনে।

উবাই ইবনে খাল্‌ফের উত্তরাধিকারীদের পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবু বকরকে (রা) বাজীর একশো উট দিয়ে দিতে হয়। তিনি সেগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নবী (সা) হুকুম দেন, এগুলো সাদকা করে দাও। কারণ বাজী যখন ধরা হয় তখন শরীয়াতে জুয়া হারাম হবার হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু এখন তা হারাম হবার হুকুম এসে গিয়েছিল। তাই যুদ্ধের ম.্যমে বশ্যতা স্বীকারকারী কাফেরদের থেকে বাজীর অর্থ নিয়ে নেয়ার অনুমতি তো দিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু এই সংগে হুকুম দেয়া হয়, তা নিজে ভোগ না করে সাদকা করে দিতে হবে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় বক্তব্য এভাবে শুরু করা হয়েছে, আজ রোমানরা পরাজিত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী মনে করছে এ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আজ যে পরা্জিত সেদিন সে বিজয়ী হয়ে যাবে।

এ ভূমিকা থেকে একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের বাহ্য দৃষ্টির কারণে শুধুমাত্র তাই দেখে যা তার চোখের সামনে থাকে। কিন্তু এ বাহ্যিক পর্দার পেছনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এ বাহ্যদৃষ্টি যখন দুনিয়ার সামান্য সামান্য ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত অনুমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যখন শুধুমাত্র "আগামীকাল কি হবে" এতটুকু কথা না জানার কারণে মানুষ ভুল হিসেব করে বসে তখন সামগ্রিকভাবে সমগ্র জীবনের ব্যাপারে ইহকালীন বাহ্যিক জীবনের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এরি ভিত্তিতে নিজের সমগ্র জীবন পুঁজিকে বাজী রাখা মস্ত বড় ভুল, তাতে সন্দেহ নেই।

এভাবে রোম ও ইরানের বিষয় থেকে ভাষণ আখেরাতের বিষয়ের দিকে মোড় নিয়েছে এবং ক্রমাগত তিন রুকূ' পর্যন্ত বিভিন্নভাবে একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আখেরাতের জীবন সম্ভব, যুক্তিসংগত এবং এর প্রয়োজনও আছে। মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করে রাখার স্বার্থেও তার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস করে বর্তমান জীবনের কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বাহ্যদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে কর্মসূচী গ্রহণ করার যে পরিণাম হয়ে থাকে তাই হতে বাধ্য।

এ প্রসংগে আখেরাতের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বিশ্ব–জগতের যেসব নিদর্শনকে সাক্ষ–প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলো তাওহীদেরও প্রমাণ পেশ করে। তাই চতুর্থ রুকূ'র শুরু থেকে তাওহীদকে সত্য ও শিরককে মিথ্যা প্রমাণ করাই ভাষণের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং বলা হয়, মানুষের জন্য পুরোপুরি একনিষ্ঠ হয়ে এক আল্লাহর বন্দেগী করা ছাড়া আর কোন প্রাকৃতিক ধর্ম নেই। শিরক বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বিরোধী। তাই যেখানেই মানুষ এ ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগে আবার সেই মহা বিপর্যয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা সে সময় দুনিয়ার দু'টি সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছে, এ বিপর্যয়ও শিরকের অন্যতম ফল এবং মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তারা সবাই ছিল মুশরিক।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে উপমার মাধ্যমে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেমন মৃত পতিত যমীন আল্লাহ প্রেরিত বৃষ্টির স্পর্শে সহসা জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং জীবন ও ফসলের ভাণ্ডার উদ্‌গীরণ করতে থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ প্রেরিত অহী ও নবুওয়াতও মৃত পতিত মানবতার পক্ষে রহমতের বারিধারা স্বরূপ এবং এর নাযিল হওয়া তার জন্য জীবন, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কল্যাণের উৎসের কারণ হয়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে আরবের এ অনুর্বর ভূমি আল্লাহর রহমতে শস্য শ্যামল হয়ে উঠবে এবং সমস্ত কল্যাণ হবে তোমাদের নিজেদেরই জন্য। আর এর সদ্ব্যবহার না করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তারপর অনুশোচনা করেও কোন লাভ হবে না এবং ক্ষতিপূরণ করার কোন সুযোগই পাবে না।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِىٓ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ
يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

আলিফ-লাম-মীম। রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে।[১] ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল। পরেও তাঁরই থাকবে।[২] আর সেদিনটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে।[৩] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান। আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ কখনো নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

১. ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রোম ও ইরানের এ যুদ্ধে মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল রোমের পক্ষে এবং মক্কার কাফেরদের সহানুভূতি ছিল ইরানের পক্ষে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। এক, ইরানীরা এ যুদ্ধকে খৃষ্টবাদ ও অগ্নি পূজার মতবাদের যুদ্ধের রূপ দিয়েছিল। তারা দেশ জয়ের উদ্দেশ্য অতিক্রম করে একে অগ্নি পূজার মতবাদ বিস্তারের মাধ্যমে পরিণত করছিল। বায়তুল মাকদিস জয়ের পর খসরু পারভেজ রোমের কায়সারের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে পরিষ্কারভাবে নিজের বিজয়কে তিনি অগ্নি উপাসনাবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। নীতিগতভাবে অগ্নি উপাসনাবাদের সাথে মক্কার মুশরিকদের ধর্মের মিল ছিল। কারণ, তারাও ছিল তাওহীদ অস্বীকারকারী। তারা দুই খোদাকে মানতো এবং আগুনের

পূজা করতো। তাই মুশরিকরা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের মোকাবিলায় খৃষ্টানরা যতই শিরকে লিপ্ত হয়ে যাক না কেন তবুও তারা তাওহীদকে ধর্মের মূল ভিত্তি বলে স্বীকার করতো। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো এবং অহী ও রিসালাতকে হিদায়াতের উৎস হিসেবে মানতো। তাই তাদের ধর্ম তার আসল প্রকৃতির দিক থেকে মুসলমানদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এ জন্য মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের ওপর মুশরিক জাতির বিজয়কে তারা অপছন্দ করতো। দ্বিতীয় কারণটি ছিল, এক নবীর আগমনের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীকে যারা মানতো নীতিগতভাবে তারা মুসলমানের সংজ্ঞারই আওতাভুক্ত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আগমনকারী নবীর দাওয়াত তাদের কাছে না পৌছে এবং তারা তা অস্বীকার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের মধ্যেই গণ্য হতে থাকে। (দেখুন সূরা কাসাস, ৭৩ টীকা) সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মাত্র পাঁচ–ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত তখনো বাইরে পৌছেনি। তাই মুসলমানরা খৃষ্টানদেরকে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করতো না। তবে ইহুদীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল কাফের। কারণ তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত অস্বীকার করতো। তৃতীয় কারণ ছিল, ইসলামের সূচনায় খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৫ এবং সূরা মায়েদার ৮২ থেকে ৮৫ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বরং তাদের মধ্য থেকে বহু লোক খোলা মন নিয়ে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করছিল। তারপর হাবশায় হিজরাতের সময় খৃষ্টান বাদশাহ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেন এবং তাদের ফেরত পাঠাবার জন্য মক্কার কাফেরদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এরও দাবী ছিল মুসলমানরা অগ্নি পূজারীদের মোকাবিলায় খৃষ্টানদের কল্যাণকামী হোক।

২. অর্থাৎ পূর্বে যখন ইরানীরা জয়লাভ করে তখন নাউযুবিল্লাহ তার অর্থ এটা ছিল না যে, বিশ্ব–জাহানের প্রভু আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে গেছেন এবং পরে যখন রোমীয়রা জয়লাভ করবে তখন এর অর্থ এ হবে না যে, আল্লাহ তাঁর হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবেন। সর্ব অবস্থায় শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। পূর্বে যে বিজয় লাভ করে তাকে আল্লাহই বিজয় দান করেন এবং পরে যে জয় লাভ করবে সেও আল্লাহরই হুকুমে জয়লাভ করবে। তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেউ নিজের শক্তির জোরে প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। তিনি যাকে উঠান সে–ই ওঠে এবং যাকে নামিয়ে দেন সে–ই নেমে যায়।

৩. ইবনে আব্বাস (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা), সুফিয়ান সওরী (র), সুদ্দী প্রমুখ মনীষীগণ বর্ণনা করেন, ইরানীদের ওপর রোমীয়রা এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর মুসলমানরা একই সময় বিজয় লাভ করেন। এ জন্য মুসলমানরা দ্বিগুণ আনন্দিত হয়। ইরান ও রোমের ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ হয়। এ বছরই রোমের কায়সার অগ্নি উপাসনাবাদের প্রবর্তক যরথুষ্ট্রের জন্মস্থান ধ্বংস করেন এবং ইরানের সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨

লোকেরা দুনিয়ার কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং আখেরাত থেকে তারা নিজেরাই গাফিল।[৪] *তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি?*[৫] *আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন।*[৬] *কিন্তু অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না।*[৭]

৪. অর্থাৎ যদিও আখেরাতের প্রমাণ পেশ করার মতো বহু সাক্ষ ও নিদর্শন রয়েছে এবং সেগুলো থেকে গাফিল হবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তবুও এরা নিজেরাই গাফিল থাকছে। অন্য কথায় এটা তাদের নিজেদের ত্রুটি। দুনিয়ার জীবনের এ বাহ্যিক পর্দার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তারা বসে রয়েছে। এর পেছনে যা কিছু আসছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। নয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাবার ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করা হয়নি।

৫. এটি আখেরাতের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র যুক্তি। এর অর্থ হচ্ছে যদি এরা বাইরে কোথাও দৃষ্টি দেবার পূর্বে নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে নিজেদের মধ্যেই এমন সব যুক্তি পেয়ে যেতো যা বর্তমান জীবনের পরে আর একটি জীবনের প্রয়োজনের সত্যতা প্রমাণ করতো। মানুষের এমন তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে যা তাকে পৃথিবীর অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করে :

এক : পৃথিবী ও তার পরিবেশের অসংখ্য জিনিস তার বশীভূত করে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহার করার ব্যাপক ক্ষমতা তাকে দান করা হয়েছে।

দুই : নিজের জীবনের পথ বেছে নেবার জন্য তাকে স্বাধীন ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। ঈমান ও কুফরী, আনুগত্য ও বিদ্রোহ এবং সুকৃতি ও দুষ্কৃতির পথের মধ্য থেকে যে কোন পথেই নিজের ইচ্ছামতো সে চলতে পারে। সত্য ও মিথ্যা এবং সঠিক ও বেঠিক যে কোন পথই সে অবলম্বন করতে পারে। প্রত্যেকটি পথে চলার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে এবং এ চলার জন্য সে আল্লাহর সরবরাহকৃত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে পারে তা আল্লাহর আনুগত্যের বা তাঁর নাফরমানির যে কোন পথই হোক না কেন।

তিন : তার মধ্যে জন্মগতভাবে নৈতিকতার অনুভূতি রেখে দেয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে সে ইচ্ছাকৃত কাজ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে ফারাক করে, ইচ্ছাকৃত কাজকে সৎকাজ ও অসৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে এই মত অবলম্বন করে যে, সৎকাজ পুরস্কার লাভের এবং অসৎকাজ শাস্তি লাভের যোগ্য হওয়া উচিত।

মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে এই যে তিনটি বৈশিষ্ট পাওয়া যায় এগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, এমন কোন সময় আসা উচিত যখন মানুষের সমস্ত কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যখন তাকে জিজ্ঞস করা হবে, তাকে দুনিয়ায় যা কিছু দেয়া হয়েছিল তা ব্যবহার করার ক্ষমতাকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে? যখন দেখা যাবে, নিজের নির্বাচনের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে সে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, না ভুল পথ? যখন তার ঐচ্ছিক কার্যাবলী যাচাই করা হবে এবং সৎকাজে পুরস্কার ও অসৎকাজে শাস্তি দেয়া হবে। একথা সুনিশ্চিত যে, মানুষের জীবনের কার্যাবলী শেষ হবার এবং তার কর্মদপ্তর বন্ধ হয়ে যাবার পরই এ সময়টি আসতে পারে, তার আগে আসতে পারে না। আর এ সময়টি অবশ্যই এমন সময় আসা উচিত যখন এক ব্যক্তি বা একটি জাতির নয় বরং সমগ্র মানবজাতির কর্মদপ্তর বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কোন ব্যক্তি বা জাতির নিজের কার্যাবলীর মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে যেসব প্রভাব বিস্তার করে যায় উক্ত ব্যক্তি বা জাতির মৃত্যুতে তার ধারাবাহিকতা খতম হয়ে যায় না। তার রেখে যাওয়া ভালো বা মন্দ প্রভাবও তো তার আমলনামায় লিখিত হওয়া উচিত। এ প্রভাবগুলো যে পর্যন্ত না পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে যায় সে পর্যন্ত ইনসাফ অনুযায়ী পুরোপুরি হিসেব-নিকেশ করা এবং পুরোপুরি পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া কেমন করে সম্ভব? এভাবে মানুষের নিজের অস্তিত্ব একথার সাক্ষ পেশ করে এবং পৃথিবীতে মানুষকে যে মর্যাদা দান করা হয়েছে তা স্বতস্ফূর্তভাবে এ দাবী করে যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের পরে আর একটি জীবন এমন হতে হবে যেখানে আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনসাফ সহকারে মানুষের জীবনের সমস্ত কার্যাবলীর হিসেব-নিকেশ করা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুসারে প্রতিদান দেয়া হবে।

৬. এ বাক্যে আখেরাতের সপক্ষে আরো দু'টি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মানুষ যদি নিজের অস্তিত্বের বাইরে বিশ্ব ব্যবস্থাকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তাহলে দু'টি সত্য সুস্পষ্টভাবে তার দৃষ্টিগোচর হবে :

এক : এ বিশ্ব-জাহানকে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন শিশুর খেলা নয়। নিছক মন ভুলাবার জন্য নিজের খেয়ালখুশী মতো সে উলটা পালটা ধরনের যে কোন রকমের একটা ঘর তৈরি করেনি যা তৈরি করা ও ভেঙে ফেলা দুটোই তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বরং এটি একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা। এর প্রতিটি অণু পরমাণু এ কথারই সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, একে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে তৈরী করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একটি আইন সক্রিয় রয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসই উদ্দেশ্যমুখী। মানুষের সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থ ব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান একথারই সাক্ষবহ। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের পেছনে সক্রিয় নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করে এবং প্রত্যেকটি বস্তু যে উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করেই মানুষ এখানে এ সবকিছু তৈরী করতে পেরেছে। অন্যথায় যদি একটি অনিয়মতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন খেলনার

মধ্যে একটি পুতুলের মতো তাকে রেখে দেয়া হতো, তাহলে কোন প্রকার বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা কল্পনাই করা যেতো না। এখন যে জ্ঞানবান সত্তা এহেন প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমুখীতা সহকারে এ দুনিয়া তৈরি করেছেন এবং এর মধ্যে মানুষের মতো একটি সৃষ্টিকে সর্ব পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার, স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে নিজের দুনিয়ার অসংখ্য সাজ–সরঞ্জাম তার হাতে সঁপে দিয়েছেন, তিনি মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেছেন একথা কেমন করে তোমাদের বোধগম্য হলো? তোমরা কি দুনিয়ায় ভাঙা ও গড়া, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, জুলুম ও ইনসাফ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের যাবতীয় কাজ কারবার করার পর এমনিই মরে মাটিতে মিশে যাবে এবং তোমাদের কোন ভালো বা মন্দ কাজের কোন ফলাফল দেখা যাবে না? তোমরা কি নিজেদের এক একটি কাজের মাধ্যমে তোমাদের ও তোমাদের মতো হাজার হাজার মানুষের জীবনের ওপর এবং দুনিয়ার অসংখ্য জিনিসের ওপর বহুতর শুভ ও অশুভ প্রভাব বিস্তার করে চলে যাবে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পরই এই সমগ্র কর্মদপ্তরকে এমনি গুটিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে?

এ বিশ্ব ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর দ্বিতীয় যে সত্যটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে সেটি হচ্ছে, এখানে কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের একটি নির্ধারিত জীবনকাল রয়েছে। সেখানে পৌঁছে যাবার পর তা শেষ হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ব্যাপারেও একথাই সত্য। এখানে যতগুলো শক্তিই কাজ করছে তারা সবই সীমাবদ্ধ। একটি সময় পর্যন্ত তারা কাজ করছে। কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটি খতম হয়ে যাবে। প্রাচীনকালে যেসব দার্শনিক ও বিজ্ঞানী দুনিয়াকে আদি ও চিরন্তন বলে প্রচার করতো তাদের বক্তব্য তবুও তো সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন কিছুটা স্বীকৃতি লাভ করতো কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব–জগতের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে নিজের ভোটটি আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে দিয়ে দিয়েছে। কাজেই বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের নাম নিয়ে এ দাবী উত্থাপন করার কোন অবকাশই নেই যে, এ দুনিয়া চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামত কোনদিন আসবে না। পুরাতন বস্তুবাদিতার যাবতীয় ভিত্তি এ চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বস্তুর বিনাশ নেই, কেবলমাত্র রূপান্তর ঘটতে পারে। তখনকার চিন্তা ছিল, প্রত্যেক পরিবর্তনের পর বস্তু বস্তুই থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন কম বেশী হয় না। এরি ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত শুনানো হতো যে, এ বস্তুজগতের কোন আদি–অন্ত নেই। কিন্তু বর্তমানে আনবিক শক্তি (Atomic Energy) আবিষ্কারের ফলে এ সমগ্র চিন্তার ধারাই উল্টে গেছে। এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত তার আকৃতিও থাকে না। ভৌতিক অবস্থানও থাকে না। এখন তাপের গতির দ্বিতীয় আইন (Second law of thermo-Dynamics) একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ বস্তুজগত না অনাদি হতে পারে, না অনন্ত। অবশ্যই এক সময় এর শুরু এবং এক সময় শেষ হতে হবে। তাই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বর্তমানে কিয়ামত অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বিজ্ঞান যদি আত্মসমর্পন করে তবে দর্শন কিসের ভিত্তিতে কিয়ামত অস্বীকার করবে?

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

আর এরা কি কখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণাম এরা দেখতে পেতো।[৮] তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল, তারা জমি কর্ষণ করেছিল খুব ভালো করে[৯] এবং এত বেশী আবাদ করেছিল যতটা এরা করেনি।[১০] তাদের কাছে তাদের রসূল আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[১১] তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।[১২] শেষ পর্যন্ত যারা অসৎকাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল বড়ই অশুভ, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা সেগুলোকে বিদ্রূপ করতো।

৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে, একথা বিশ্বাস করে না।

৮. আখেরাতের পক্ষে এটি একটি ঐতিহাসিক যুক্তি। এর অর্থ হচ্ছে, কেবল দুনিয়ার দু'চারজন লোকই তো আখেরাত অস্বীকার করেনি বরং মানব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। বরং অনেক জাতির সমস্ত লোকই আখেরাত অস্বীকার করেছে অথবা তা থেকে গাফিল হয়ে গেছে কিংবা মৃত্যু পরের জীবন সম্পর্কে এমন মিথ্যা বিশ্বাস উদ্ভাবন করে নিয়েছে যার ফলে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে গেছে। তারপর ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, যেভাবেই আখেরাত অস্বীকার করা হোক না কেন, তার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত হয়েছে। তারা জুলুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্লীল আচরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ জিনিসটির বদৌলতে জাতিসমূহ একের পর এক ধ্বংস হতে থেকেছে। হাজার বছরের ইতিহাসে মানব বংশ একের পর এক যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা কি একথা প্রমাণ করে না যে, আখেরাত একটি সত্য, যা অস্বীকার করা মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বস্তুকে সবসময় মাটির দিকে নেমে আসতে দেখেছে বলেই সে ভারী জিনিসের আকর্ষণ স্বীকার করে। যে বিষ খেয়েছে সে-ই মারা পড়েছে, এ জন্যই মানুষ

বিষকে বিষ বলে মানে। অনুরূপভাবে আখেরাত অস্বীকার যখন চিরকাল মানুষের নৈতিক বিকৃতির কারণ প্রমাণিত হয়েছে তখন এ অভিজ্ঞতা কি এ শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আখেরাত একটি জাজ্বল্যমান সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা ভুল?

৯. মূল শব্দ হচ্ছে أَثَارُوا الْأَرْضَ কৃষিকাজ করার জন্য লাঙ্গল দেয়া অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে আবার মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভ থেকে পানি উঠানো, খাল খনন এবং খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বের করাও হয়।

১০. যারা নিছক বস্তুগত উন্নতিকে একটি জাতির সৎ হবার আলামত মনে করে এখানে তাদের যুক্তির জবাব রয়েছে। তারা বলে যারা পৃথিবীর উপায়-উপকরণকে এত বিপুল পরিমাণে ব্যবহার (Exploit) করেছে তারা দুনিয়ায় বিরাট উন্নয়নমূলক কাজ করেছে এবং একটি মহিমান্বিত সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। কাজেই মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবেন এটা কেমন করে সম্ভব। কুরআন এর জবাব এভাবে দিয়েছে "এমন উন্নয়নমূলক কাজ" পূর্বেও বহু জাতি বিরাট আকারে করেছে। তারপর কি তোমরা দেখনি সে জাতিগুলো তাদের নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সহকারে ধূলায় মিশে গেছে এবং তাদের "উন্নয়নের' আকাশচুম্বী প্রাসাদ ভুলুণ্ঠিত হয়েছে? যে আল্লাহর আইন ইহজগতে সত্যের প্রতি বিশ্বাস ও সৎ চারিত্রিক গুণাবলী ছাড়া নিছক বস্তুগত নির্মাণের এরূপ মূল্য দিয়েছে সে একই আল্লাহর আইন কি কারণে পারলৌকিক জগতে তাকে জাহান্নামে স্থান দেবে না?

১১. অর্থাৎ এমন নিদর্শনাবলী নিয়ে যা তাদেরকে সত্য নবী হবার নিশ্চয়তা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখানকার পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে নবীদের আগমনের কথা উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, একদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে, এর বাইরে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থায় এবং মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় আখেরাতের সাক্ষ বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে একের পর এক নবীগণ এসেছেন। তাঁদের সাথে তাঁদের নবুওয়াত সত্য হবার সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যেতো এবং যথার্থই আখেরাতের আগমন সম্পর্কে তাঁরা মানুষকে সতর্কও করতেন।

১২. অর্থাৎ এরপর এ জাতিগুলো যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে তা তাদের ওপর আল্লাহর জুলুম ছিল না বরং তা ছিল তাদের নিজেদের জুলুম। এসব জুলুম তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছিল। যে ব্যক্তি বা দল নিজে সঠিক চিন্তা করে না এবং অন্যের বুঝিয়ে দেবার পরও সঠিক নীতি অবলম্বন করে না সে নিজেই নিজের অশুভ পরিণামের জন্য দায়ী হয়। এ জন্য আল্লাহকে দোষারোপ করা যেতে পারে না। আল্লাহ নিজের কিতাব ও নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের জ্ঞান দেবার ব্যবস্থাও করেছেন এবং তাকে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্বিক উপকরণাদিও দিয়েছেন যেগুলো ব্যবহার করে সে সবসময় নবী ও আসমানী কিতাব প্রদত্ত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে পারে। এ পথনির্দেশনা এবং এ উপকরণাদি থেকে আল্লাহ যদি মানুষকে বঞ্চিত করে থাকতেন এবং সে অবস্থায় মানুষকে ভুল পথে যাবার ফল পেতে হতো তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহর বিরুদ্ধে জুলুমের দোষারোপ করার অবকাশ সৃষ্টি হতে পারতো।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন।[১৩] তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। আর যখন সে সময়টি[১৪] সমাগত হবে, সেদিন অপরাধী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবে।[১৫] তাদের বানানো শরীকদের মধ্য থেকে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না[১৬] এবং তারা নিজেদের শরীকদেরকে অস্বীকার করবে।[১৭]

১৩. কথাটি দাবীর ভংগীতে বলা হলেও দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিও এর মধ্যে রয়ে গেছে। সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি একথার সাক্ষ দিয়ে থাকে যে, সৃষ্টির সূচনা করা যার পক্ষে সম্ভবপর তার পক্ষে একই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করা আরো ভালোভাবেই সম্ভবপর। সৃষ্টির সূচনা তো একটি বাস্তব সত্য, বিষয়টি সবার সামনেই রয়েছে। কাফের ও মুশরিকরাও এটাকে আল্লাহর কাজ বলে স্বীকার করে। এরপর যে আল্লাহ এ সৃষ্টির সূচনা করেন তিনি এর পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না, তাদের এ চিন্তা একেবারেই অর্থহীন ও অযৌক্তিক।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ফিরে যাবার এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হবার সময়।

১৫. মূল শব্দ হচ্ছে ابلاس -এর অর্থ হচ্ছে চরম হতাশা ও দুঃখ-বেদনার কারণে কোন ব্যক্তির একেবারে হতবাক ও স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। আশার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে দেখে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যাওয়া এবং কোন যুক্তি ও সমর্থন না পাওয়ার কারণে রুদ্ধশ্বাস হওয়া। এ শব্দটি যখন অপরাধীর জন্য ব্যবহার করা হয় তখন মনের পাতায় তার যে ছবি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তিকে অপরাধ করার সময় হাতে নাতে পাকড়াও করা হয়েছে। সে পালাবার কোন পথ পাচ্ছে না এবং নিজের সাফাই গাইবার জন্য কোন জিনিস পেশ করে বের হয়ে আসার আশাও রাখে না। তাই তার কন্ঠরুদ্ধ এবং চরম হতাশা ও মনমরা অবস্থায় সে অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত একথাটাও উপলব্ধি করতে হবে যে, এখানে অপরাধী বলতে কেবল দুনিয়ায় যারা হত্যা, চুরি, ডাকাতি ও এ ধরনের অন্যান্য অপরাধ করে তাদের কথা বলা হয়নি বরং এমন সব লোকের কথা এখানে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাঁর রসূলদের শিক্ষা ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং আখেরাতে জবাবদিহি করার কথা অস্বীকার করে অথবা সে ব্যাপারে নির্বিকার থেকে এবং দুনিয়ায় আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের অথবা নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে থেকেছে। এ মূল ভ্রষ্টতার

সাথে সাধারণ্যে অপরাধ বলা হয়ে থাকে এমন কাজ তারা করলেও বা না করলেও কিছু আসে যায় না। এ ছাড়াও এমনসব লোকও এর অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যারা আল্লাহকে মেনে নিয়ে তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনে আখেরাতকে স্বীকার করে নিয়ে তারপর আবার জেনে বুঝে নিজেদের রবের নাফরমানী করেছে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের বিদ্রোহীনীতিতে অবিচল থেকেছে। এরা নিজেদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীতে আখেরাতের জগতে হঠাৎ করে জেগে উঠবে এবং দেখবে, সত্যিই তো এখানে সেই পরবর্তী জীবন শুরু হয়ে গেছে, যা অস্বীকার করে অথবা যাকে উপেক্ষা করে তারা দুনিয়ায় কাজ করতো। তখন তাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের ওপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে يبلس المجرمون বাক্যাংশে যার ছবি অংকন করা হয়েছে।

১৬. তিন ধরনের সত্তার ওপর শরীক শব্দটির প্রয়োগ হয়। এক, ফেরেশতা, নবী, আউলিয়া, শহীদ ও পুণ্যবান লোক। মুশরিকরা বিভিন্ন যুগে এদেরকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী গণ্য করে এদের সামনে বন্দেগী ও পূজার যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। কিয়ামতের দিন তারা পরিষ্কার বলে দেবে, এসব কিছু করেছো তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বরং আমাদের শিক্ষা ও পথনির্দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে। তাই তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের শাফায়াতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আমরা কিছু আবেদন নিবেদন করবো, এ আশা আমাদের ব্যাপারে করো না। দুই, এমন সব জিনিস যেগুলোর চেতনা নেই অথবা প্রাণ নেই। যেমন ঃ চাঁদ, সূর্য, তারকা, গাছ, পাথর, পশু ইত্যাদি। মুশরিকরা তাদেরকে খোদায় পরিণত করে, এদের পূজা-উপাসনা করে এবং এদের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে। কিন্তু এই জড় ও নির্জীব জিনিসগুলো একথা জানতেই পারে না যে, আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষ এসব নজরানা তাদের জন্য উৎসর্গ করছে। একথা সুস্পষ্ট যে, এদের মধ্য থেকে একজনও তাদের সুপারিশের জন্য সামনে অগ্রসর হবে না। তিন, এমন সব বড় বড় অপরাধী যারা নিজেরাই চেষ্টা করে, ধোঁকা ও প্রতারণার পথ অবলম্বন করে, মিথ্যার জাল ছড়িয়ে দিয়ে অথবা শক্তি প্রয়োগ করে দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দাদের থেকে নিজেদের বন্দেগী ও পূজা আদায় করে নিয়েছে। যেমন শয়তান, ভণ্ড ধর্মীয় নেতা এবং জালেম ও স্বৈরাচারী শাসনকর্তা ইত্যাদি। এরা সবাই সেখানে বিপদের শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত থাকবে। নিজেদের এ ভক্তবৃন্দের সুপারিশের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা বরং তারা নিজেদের আমলনামার বোঝা হালকা করার চেষ্টা করতে থাকবে। হাশরের ময়দানে তারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকবে যে, এদের অপরাধের জন্য এরা নিজেরাই দায়ী এবং এদের পথভ্রষ্টতার জন্য আমাদের দুর্ভোগ পোহানো উচিত নয়। এভাবে মুশরিকরা সেখানে কোন দিক থেকে কোন প্রকার শাফায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না।

১৭. অর্থাৎ সে সময় মুশরিকরা একথা স্বীকার করবে যে, তাদেরকে আল্লাহর শরীক করে তারা ভুল করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্য থেকে কারো আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন অংশ নেই, এ সত্যটি তখন তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে। তাই দুনিয়ায় আজ তারা যে শিরকের ওপর টিকে থাকার জন্য চাপ দিচ্ছে আখেরাতে তাকেই অস্বীকার করবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾

যেদিন সেই সময়টি সমাগত হবে সেদিন (সমস্ত মানুষ) পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।[১৮] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা একটি বাগানে[১৯] আনন্দে থাকবে।[২০]

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় আজ জাতি, বংশ, গোত্র, স্বদেশ, ভাষা, পরিবার এবং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট যতগুলো দলীয় বিভক্তি রয়েছে এসবই সেদিন ভেঙ্গে পড়বে। নির্ভেজাল আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে নতুন করে এখন ভিন্নতর দল গঠিত হবে। একদিকে সমগ্র মানব জাতির পূর্বের ও পরের সমগ্র প্রজন্মের মধ্য থেকে মু'মিন ও সৎ লোকদেরকে ছেঁটে আলাদা করে নেয়া হবে এবং তাদের সবাই হবে একটি দলভুক্ত। অন্যদিকে এক ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস পোষণকারী এবং এক এক ধরনের অপরাধজীবী মানুষদেরকে সেই বিশাল জনসমুদ্র থেকে ছাঁটাই বাছাই করে আলাদা করে নেয়া হবে এবং তাদের পৃথক পৃথক দল সৃষ্টি হয়ে যাবে। অন্য কথায় এভাবে বলা যায়, ইসলাম যেসব জিনিসকে এ দুনিয়ায় বিভেদ অথবা ঐক্যের ভিত্তি গণ্য করে এবং যেগুলোকে জাহেলিয়াত পন্থীরা এখানে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আখেরাতে তারই ভিত্তিতে বিভেদও হবে আবার ঐক্যও।

ইসলাম বলে, মানুষদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং পরস্পরের সাথে জুড়ে দেবার আসল জিনিস হচ্ছে তার আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর নির্দেশের ওপর তাদের জীবন ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলে তারা সবাই একই দলভুক্ত। তাদের সম্পর্ক বিভিন্ন বংশ ও দেশের সাথেও হতে পারে। অন্যদিকে কুফরী ও ফাসেকীর পথ অবলম্বনকারীরা অন্য একটি দলভুক্ত। তাদের সম্পর্ক যে কোন বংশ ও দেশের সাথেও হতে পারে। এদের উভয়ের জাতীয়তা এক হতে পারে না। এরা দুনিয়ায় সম্মিলিতভাবে একক জীবনপথ নির্মাণ করে তার ওপর একসাথে চলতে পারে না। ওদিকে আখেরাতেও তাদের পরিণাম একই রকম হতে পারে না। দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত তাদের পথ ও মনযিল পরস্পর থেকে আলাদা হয়। পক্ষান্তরে জাহেলিয়াতপন্থীরা প্রত্যেক যুগে এ ব্যাপারে জোর দিতে থেকেছে এবং আজো তারা এ ব্যাপারে অবিচল যে, বংশ, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষের দলবদ্ধ হওয়া উচিত। যাদের মধ্যে এ ভিত্তিগুলোর ব্যাপারে একাত্মতা রয়েছে তাদের ধর্ম ও আকীদা–বিশ্বাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক জাতিতে পরিণত হয়ে এমনি ধরনের অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া উচিত এবং এ জাতীয়তাবাদের এমন একটি জীবন ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে তাওহীদ, শিরক ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসীরা সবাই একসাথে চলতে পারে। এটিই ছিল আবু জেহেল, আবু লাহাব ও কুরাইশ সরদারদের চিন্তাধারা। তারা বারবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছিল যে, এ ব্যক্তি এসে আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদ এখানে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করছে যে, এ

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছে[২১] তাদেরকে আযাবে হাজির রাখা হবে।

কাজেই[২২] আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো[২৩] যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের সকাল হয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং (তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়।[২৪] তিনি জীবিত থেকে মৃত্যুকে বের করেন এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।[২৫] অনুরূপভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা থেকে) বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।

দুনিয়ায় মিথ্যার ভিত্তিতে তোমরা এই যেসব দল গঠন করেছো এগুলো সবই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বে। ইসলাম দুনিয়ার এ জীবনে যে বিশ্বাস, জীবনাদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় মানব জাতির মধ্যে তারি ভিত্তিতে স্থায়ী পার্থক্য গড়ে উঠবে। যাদের গন্তব্য এক নয় তাদের জীবনের পথই বা কেমন করে এক হতে পারে।

১৯. 'একটি বাগান' কথাটি এখানে বাগানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার মতো আমাদের ভাষায়ও একটি পরিচিত বর্ণনাভংগী রয়েছে। কোন ব্যক্তি কাউকে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে বলে এবং এই সংগে একথাও বলে, যদি তুমি একাজটি করে দাও তাহলে আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো। এখানে একটি জিনিসের অর্থ এ হয় না যে, সংখ্যার দিক দিয়ে তা একটিই হবে। বরং এর উদ্দেশ্য হয়, এর পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস দেবো, যা পেয়ে তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হবে।

২০. এখানে মূলে يُحْبَرُونَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আনন্দ, স্বাদ, আড়ম্বর, জাঁকজমক ও মর্যাদার ধারণা এর অর্থের অন্তরভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে অত্যন্ত মর্যাদা

সহকারে রাখা হবে, আনন্দে ও আরাম–আয়েশে থাকবে এবং সব রকম ভোগে পরিতৃপ্ত হবে।

২১. একথাটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য যে, ঈমানের সাথে সৎকাজের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে মানুষ মহান মর্যাদা সম্পন্ন পরিণামফল ভোগ করবে। কিন্তু কুফরীর অশুভ পরিণাম বর্ণনা প্রসংগে অসৎকাজের কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, মানুষের পরিণাম নষ্ট করার জন্য কুফরীই যথেষ্ট। অসৎকাজের সাথে তার শামিল হওয়ায় বা না হওয়ায় কিছু যায় আসে না।

২২. এখানে "কাজেই" শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, যখন তোমরা জানতে পারলে ঈমান ও সৎকাজের এহেন পরিণাম হবে এবং কুফরী ও মিথ্যা আরোপের এহেন পরিণাম হবে তখন তোমাদের এ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাছাড়া "কাজেই" শব্দটির এ অর্থও হয় যে, মুশরিক ও কাফেররা পরকালীন জীবনকে অসম্ভব গণ্য করে আল্লাহকে মূলত অক্ষম ও অপারগ ঘোষণা করছে। কাজেই এর মোকাবিলায় তুমি আল্লাহর প্রশংসা করো, তাঁর মহিমা প্রচার করো এবং এ দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত একথা ঘোষণা করে দাও। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মু'মিন সমাজকে।

২৩. আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, মুশরিকরা নিজেদের শিরক ও আখেরাত অস্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি যেসব দোষ–ত্রুটি ও দুর্বলতা আরোপ করে থাকে সেই অনন্য মহামহিম সত্তাকে তা থেকে পাক–পবিত্র ঘোষণা করা এবং একথা প্রকাশ করা। এ ঘোষণা ও প্রকাশের সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নামায। এরি ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনে যায়েদ ও অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এখানে "তাসবীহ পাঠ" তথা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ নামায পড়া। এ তাফসীরের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই রয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য কয়েকটি বিশেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ সমস্ত দোষ–ত্রুটিমুক্ত—এ আকীদা পোষণ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য আবার সকাল–সাঁঝে এবং দুপুরে (জোহর) ও রাতের ('ঈশা) নামাযের সময় নির্ধারণের প্রশ্নই উঠতো না। কারণ এ আকীদা তো মুসলমানদের সবসময়ই পোষণ করতে হবে। এভাবে যদি শুধুমাত্র মুখেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলেও এ সময়গুলো নির্ধারণ করার কোন অর্থ হয় না। কারণ মুসলমানকে তো সবসময় এ আকীদা প্রকাশ করতে হবে। এভাবে যদি নিছক কণ্ঠের মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলেও এ সময়গুলো নির্ধারণ করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ মুসলমানকে তো সর্বক্ষণ একথা প্রকাশ করতে হবে। তাই সময় নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহর গুণ ও মহিমা প্রচার করার হুকুম নিসন্দেহে তার একটি বিশেষ কার্যকর কাঠামোর প্রতিই ইংগিত করে। আর এ কার্যকর কাঠামোটি নামায ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৪. এ আয়াতে নামাযের চারটি সময়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে : ফজর, মাগরিব, আসর ও যোহর। এ ছাড়াও নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন মজিদে আরো যেসব ইশারা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে :

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط

"নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠ করো।" (বনী ইসরাঈল, ৭৮)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط

"আর নামায কায়েম করো দিনের দুই মাথায় এবং রাতের কিছু অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর।" (হূদ, ১১৪ আয়াত)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ ـ

"আর তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো সূর্য উদিত হবার আগে এবং তার অস্ত যাবার আগে। আর রাতের কিছু সময়ও আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তভাগেও।" (ত্বা-হা, ১৩০ আয়াত)

এর মধ্য থেকে প্রথম আয়াতটি বলছে ঃ নামাযের সময়সীমা হচ্ছে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ঈশা পর্যন্ত এবং এরপর হচ্ছে ফজরের সময়। দ্বিতীয় আয়াতে দিনের দুই প্রান্ত অর্থ ফজর ও মাগরিবের সময় এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পরের সময়টি হচ্ছে ঈশার ওয়াক্ত। তৃতীয় আয়াতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে অর্থ জফরের সময় এবং অস্তমিত হওয়ার পূর্বে অর্থ আসরের সময়। রাতের সময়ের মধ্যে মাগরিব ও ঈশা উভয়ই অন্তরভুক্ত। আর দিনের প্রান্ত হচ্ছে তিনটি ঃ এক, সকাল, দুই, সূর্য ঢলে পড়া এবং তিন, মাগরিব। এভাবে সারা দুনিয়ার মুসলমানরা আজ যে পাঁচটি সময়ে নামায পড়ে থাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে সে সময়গুলোর প্রতি ইংগিত করেছে। কিন্তু একথা স্পষ্ট শুধুমাত্র এ আয়াতগুলো পাঠ করে কোন ব্যক্তিও নামাযের সময় নির্ধারণ করতে পারতো না। মহান আল্লাহর নিযুক্ত কুরআনের শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাদেরকে পথনির্দেশনা না দিলে তাদের পক্ষে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

এখানে একটু থেমে হাদীস অস্বীকারকারীদের ধৃষ্ঠতার কথা ভাবুন। তারা "নামায পড়া" কে বিদ্রূপ করে এবং বলে, মুসলমানরা বর্তমানে যে নামায পড়ছে এটা আদতে সে জিনিসই নয় কুরআনে যার হুকুম দেয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, কুরআন তো নামায কায়েম করার হুকুম দেয় এবং তার অর্থ নামায পড়া নয় বরং "রবুবিয়াতের ব্যবস্থা" কায়েম করা। এখন তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করুন, রবুবিয়াতের এ অভিনব ব্যবস্থাটি কোন্ ধরনের যাকে সূর্য উদিত হবার পূর্বেই কায়েম করা যেতে পারে অথবা আবার সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে কিছু রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্তও কায়েম করা যায়? আর কোন্ ধরনের রবুবিয়াত ব্যবস্থা বিশেষ করে জুমার দিন কায়েম করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে?

اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

আর বিশেষ ধরনের এমন কি রবুবিয়াত ব্যবস্থা আছে যা কায়েম করার জন্য মানুষ যখন অগ্রসর হয় তখন প্রথমে মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নেয় এবং পা ধুয়ে ফেলে গাঁট পর্যন্ত আর এই সাথে মাথাও মসেহ করে নেয়, অন্যথায় তাকে কায়েম করা যেতে পারে না?

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

আর রবুবিয়াত ব্যবস্থার মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে, যার ফলে যদি মানুষ নাপাকির অবস্থায় থাকে, তাহলে যতক্ষণ গোসল না করে নেয় ততক্ষণ তাকে কায়েম করতে পারে না?

لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ .... وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ـ

আর এটাই বা কেমন ব্যাপার, যদি কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে মিলন করে এবং সেখানে পানি না পাওয়া যায় তাহলে এ অদ্ভুত রবুবিয়াত ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য পাক-পবিত্র মাটিতে হাত ঘসে নিয়ে সেই হাত মুখমণ্ডলের ওপর ঘসতে হবে?

اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ـ

আর এ কেমন ধরনের অদ্ভুত রবুবিয়াত ব্যবস্থা যে, যদি কখনো সফর করতে হয় তাহলে মানুষ তাকে পুরোপুরি কায়েম করার পরিবর্তে অর্ধেকটাই কায়েম করে?

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

আর এটা কোন্ ধরনের কৌতুকপ্রদ ব্যাপার যে, যদি মুসলিম সেনাদল শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, তাহলে সেনাদলের অর্ধেক সিপাহী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" কায়েম করতে থাকবে এবং বাকি অর্ধেক ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকবে? তারপর যখন প্রথম দলটি ইমামের পেছনে রবুবিয়াত ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে একটি সিজদা করে নেবে তখন উঠে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি তাদের জায়গায় এসে ইমামের পেছনে "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" কায়েম করতে থাকবে?

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ ـ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝٢٠ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١

৩ রুকূ'

তাঁর[২৬] নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর সহসা তোমরা হলে মানুষ, (পৃথিবীর বুকে) ছড়িয়ে পড়ছো।[২৭]

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে,[২৮] যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো[২৯] এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।[৩০] অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো একথা পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে যে নামায কায়েম করার অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের নামায কায়েম করা যা সারা দুনিয়ার মুসলমানরা পড়ে থাকে। কিন্তু হাদীস অস্বীকারকারীদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরা পরিবর্তিত না হয়ে ইসলামকে পরিবর্তিত করার জন্য চাপ দিয়ে চলছে। আসলে যতক্ষণ কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর মোকাবিলায় একেবারেই শংকাহীন ও নির্লজ্জ না হয়ে যায় ততক্ষণ সে তাঁর বাণীর সাথে এ বিদ্রূপাত্মক আচরণ করতে পারে না, যা এরা করছে। অথবা এমন এক ব্যক্তি কুরআনের সাথে এ তামাশা করতে পারে যে নিজের মনে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকৃতি দেয় না এবং নিছক ধোঁকা দেবার জন্য কুরআন কুরআন বলে চিৎকার করে মুসলমানদেরকে গোমরাহ করতে চায়। (এ প্রসঙ্গে সামনের দিকে ৫০ টীকাও দেখে নিন)

২৫. অর্থাৎ যে আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সামনে এ কাজ করছেন তিনি মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে অক্ষম হতে পারেন কেমন করে? তিনি সবসময় জীবিত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারদের মধ্য থেকে বর্জ্য পদার্থ (Waste Matter) বের করছেন যেগুলোর মধ্যে জীবনের সামান্যতম গন্ধও নেই। তিনি প্রতি মুহূর্তে নিষ্প্রাণ বস্তুর (Dead Matter) মধ্যে জীবন সঞ্চার করে অসংখ্য পশু, উদ্ভিদ ও মানুষ সৃষ্টি করে চলছেন। অথচ যেসব উপাদান থেকে এ জীবন্ত সত্তাগুলোর শরীর গঠিত হচ্ছে তাদের মধ্যে সামান্যতমও জীবনের চিহ্ন নেই। তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের এ দৃশ্য দেখিয়ে চলছেন যে, অনুর্বর, অনুন্নত, অনাবাদি পতিত জমিতে বৃষ্টির পানি পড়ার সাথে সাথেই সহসা সেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের বিপুল সমারোহ দেখা যায়। এ সবকিছু দেখার পরও যদি কোন ব্যক্তি

মনে করে সৃষ্টির এ কারখানা পরিচালনাকারী আল্লাহ মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম, তাহলে আসলে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তার বাইরের চোখ দু'টি যে বাহ্যিক দৃশ্যাবলী দেখে থাকে, তার বুদ্ধির চোখ তার মধ্যে দৃশ্যমান উজ্জ্বল সত্য দেখতে পায় না।

২৬. মনে রাখতে হবে, এখান থেকে রুকূ'র শেষ অবদি মহান আল্লাহর যেসব নিদর্শন বর্ণনা করা হচ্ছে, সেগুলো তো একদিকে বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে পরকালীন জীবনের সম্ভাবনা ও অস্তিত্বশীলতার কথা প্রমাণ করে এবং অন্যদিকে এ নিদর্শনগুলোই প্রমাণ করে যে, এ বিশ্ব–জাহান ইলাহ বিহীন নয় এবং এর ইলাহও বহু নয় বরং এক ও একক ইলাহই এর স্রষ্টা, পরিচালক, মালিক ও শাসক। তিনি ছাড়া মানুষের আর কোন মাবুদ হওয়া উচিত নয়। অনুরূপভাবে এ রুকূ'টি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পূর্বের ও পরের উভয় ভাষণের সাথে সম্পৃক্ত।

২৭. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি রহস্য এ ছাড়া আর কি যে, কয়েকটি নিষ্প্রাণ উপাদানের সমাহার, যেগুলো এ পৃথিবীর বুকে পাওয়া যায়। যেমন কিছু কার্বন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম এবং এ ধরনের আরো কিছু উপাদান। এগুলোর রাসায়নিক সংযোগের মাধ্যমে মানুষ নামক একটি বিস্ময়কর সত্ত্বা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আবেগ, অনুভূতি, চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা–কল্পনার এমন সব অদ্ভুত শক্তি যাদের কোন একটির উৎসও তার মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। তারপর শুধু এতটুকুই নয় যে, হঠাৎ একজন মানুষ এমনি ধরনের এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বরং তার মধ্যে এমন সব অদ্ভুত প্রজনন শক্তিও সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার বদৌলতে কোটি কোটি মানুষ সে একই কাঠামো এবং যোগ্যতার অধিকারী হয়ে অসংখ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং সীমাসংখ্যাহীন ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের ধারক হিসেবে বের হয়ে আসছে। তোমার বুদ্ধি কি এ সাক্ষ দেয়, এ চূড়ান্ত জ্ঞানময় সৃষ্টি কোন জ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম ছাড়াই আপনা আপনিই অস্তিত্বশীল হয়েছে? তুমি কি সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় একথা বলতে পারো, মানুষ সৃষ্টির মতো মহত্তম পরিকল্পনা, তাকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং পৃথিবী ও আকাশের সংখ্যাতীত শক্তিকে মানব জীবন গঠনের উপযোগী করে দেয়া, এগুলো কি বহু ইলাহর চিন্তা ও ব্যবস্থাপনার ফল হতে পারে? আর তোমরা যখন মনে করতে থাকো, যে আল্লাহ মানুষকে নিরেট অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি সেই মানুষকে মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না, তখন তোমাদের মস্তিষ্ক কি সঠিক অবস্থায় থাকে?

২৮. অর্থাৎ স্রষ্টার প্রজ্ঞার পূর্ণতা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র একটি জাতি (Sexes) সৃষ্টি করেননি বরং তাকে দু'টি জাতির আকারে সৃষ্টি করেছেন। মানবিকতার দিক দিয়ে তারা একই পর্যায়ভুক্ত। তাদের সৃষ্টির মূল ফরমুলাও এক। কিন্তু তারা উভয়ই পরস্পর থেকে ভিন্ন শারীরিক আকৃতি, মানসিক ও আত্মিক গুণাবলী এবং আবেগ–অনুভূতি ও উদ্যোগ নিয়ে জন্মলাভ করে। আবার তাদের মধ্যে এমন বিস্ময়কর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার ফলে তারা প্রত্যেকে পুরোপুরি অন্যের জোড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের শরীর এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যোগসমূহ অন্যের শারীরিক ও প্রবৃত্তির দাবীসমূহের পরিপূর্ণ জবাব। এ ছাড়াও সেই প্রাজ্ঞ স্রষ্টা এ উভয় জাতির

লোকদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকেই বরাবর এ আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করে চলবেন। আজ পর্যন্ত কখনো দুনিয়ার কোন জাতির মধ্যে বা কোন এলাকায় কেবলমাত্র পুত্র সন্তানই জন্মলাভ করছে, এমনটি দেখা যায়নি। অথবা কোথাও কেবলমাত্র কন্যা সন্তানই জন্মলাভ করে চলছে এমন কথাও শোনা যায়নি। এটা এমন একটা জিনিস যার মধ্যে কোন মানুষের হস্তক্ষেপ বা বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগের সামান্যতম অবকাশই নেই। মানুষ এ ব্যাপারে সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যে, মেয়েরা অনবরত এমন মেয়েলী বৈশিষ্ট এবং ছেলেরা অনবরত এমন পুরুষালী বৈশিষ্ট নিয়ে জন্মলাভ করতে থাকবে যা তাদের পরস্পরকে যথার্থ জোড়ায় পরিণত করবে। আর নারী ও পুরুষদের জন্ম এমনি ধারাবাহিকভাবে একটি আনুপাতিক হারে হয়ে যেতে থাকবে, এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করার কোন মাধ্যম তার নেই। হাজার হাজার বছর থেকে কোটি কোটি মানুষের জন্মলাভে এ কৌশল ও ব্যবস্থার এমনই সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে কার্যকর থাকা কখনো নিছক আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না আবার বহু ইলাহর সম্মিলিত ব্যবস্থাপনার ফলও এটা নয়। এ জিনিসটি সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করে যে, একজন বিজ্ঞানী আর শুধুমাত্র একজন মহা বিজ্ঞানী স্রষ্টাই তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে শুরুতে পুরুষ ও নারীর একটি সর্বাধিক উপযোগী ডিজাইন তৈরি করেন। তারপর তিনি এ ডিজাইন অনুযায়ী অসংখ্য পুরুষ ও অসংখ্য নারীর তাদের পৃথক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট সহকারে সারা দুনিয়ায় একটি আনুপাতিক হারে জন্মলাভ করার ব্যবস্থা করেন।

২৯. অর্থাৎ এটা কোন অপরিকল্পিত ব্যবস্থা নয়। বরং স্রষ্টা নিজেই পরিকল্পিতভাবে এ ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে পুরুষ তার প্রাকৃতিক দাবী নারীর কাছে এবং নারী তার প্রাকৃতিক চাহিদা পুরুষের কাছে লাভ করবে এবং তারা উভয়ে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত থেকেই প্রশান্তি ও সুখ লাভ করবে। এ বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাপনাকে স্রষ্টা একদিকে মানব বংশধারা অব্যাহত থাকার এবং অন্যদিকে মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অস্তিত্ব দান করার মাধ্যমে পরিণত করেছেন। যদি এ দু'টি জাতিকে নিছক দু'টি পৃথক ডিজাইনে তৈরি করা হতো এবং তাদের মধ্যে এমন অস্থিরতা সৃষ্টি না করা হতো, যা তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক ছাড়া প্রশান্তিতে পরিণত হতে পারতো না তাহলে সম্ভবত ছাগল-ভেড়ার মতো মানুষের বংশ ধারাও এগিয়ে যেতো কিন্তু তাদের সাহায্যে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। স্রষ্টা নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পরস্পরের জন্য এমন চাহিদা, তৃষ্ণা ও অস্থিরতার অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন যার ফলে তারা উভয়ে মিলে একসাথে না থাকলে শান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে না। সমগ্র প্রাণীজগতের বিপরীতে মানব জাতির মধ্যে এটিই হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ। এ শান্তির অন্বেষাই তাদেরকে একত্রে ঘর বাঁধতে বাধ্য করে। এরি বদৌলতে পরিবার ও গোত্র অস্তিত্ব লাভ করে। এর ফলে মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। এ বিকাশে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা অবশ্যই সহায়ক হয়েছে। কিন্তু তা তার আসল উদ্দোক্তা নয়। আসল উদ্দোক্তা হচ্ছে এ অস্থিরতা, যাকে পুরুষ ও নারীর অস্তিত্বের মধ্যে সংস্থাপিত করে তাদেরকে "ঘর" বাঁধতে বাধ্য করা হয়েছে। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা ভাবতে পারেন যে, এ বিপুল প্রজ্ঞা প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহ থেকে হঠাৎ এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে? অথবা বহু সংখ্যক ইলাহ কি এমনি ধরনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতো, যার ফলে তারা

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۤؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি[৩১] এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য।[৩২] অবশ্যই তার মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে ঘুমানো এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা।[৩৩] অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন এমনসব লোকদের জন্য যারা (গভীর মনোযোগ সহকারে) শোনে।

এ গভীর জ্ঞানময় উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাজার হাজার বছর থেকে অনবরত অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে এ বিশেষ অস্থিরতা সহকারে সৃষ্টি করে যেতে থাকতো? এ তো একজন জ্ঞানীর এবং মাত্র একজন জ্ঞানীরই প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট নিদর্শন। কেবলমাত্র বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিই এটি দেখতে অস্বীকার করতে পারে।

৩০. ভালোবাসা বলতে এখানে কামসিক্ত ভালোবাসার (Sexual Love) কথা বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এটি আকর্ষণের প্রাথমিক উদ্দোক্তায় পরিণত হয়। তারপর তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন করে রাখে। আর "রহমত" তথা দয়া মানে হচ্ছে এমন একটি আত্মিক সম্পর্ক, যা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে। এর বদৌলতে তারা দু'জনে দু'জনার কল্যাণাকাংখী, দু'জনের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং উভয়ের সুখে-দুখে শরীক হয়ে যায়। এমনকি এমন এক সময় আসে যখন কামসিক্ত ভালোবাসা পেছনে পড়ে থাকে এবং বার্ধক্যে এ জীবনসাথী যৌবনকালের চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে পরস্পরের জন্য দয়া, স্নেহ ও মমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। মানুষের মধ্যে শুরুতেই যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তাকে সাহায্য করার জন্য স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এ দু'টি ইতিবাচক শক্তি সৃষ্টি করে দেন। এ অস্থিরতা তো শুধুমাত্র শান্তির প্রত্যাশী এবং এর সন্ধানে সে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের দিকে নিয়ে যায়। এরপর এ দু'টি শক্তি অগ্রসর হয়ে তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের এমন একটি সম্পর্ক জুড়ে দেয় যা দু'টি পৃথক পরিবেশে লালিত আগন্তুকদেরকে একসাথে মিলিয়ে গভীরভাবে সংযুক্ত করে দেয়। এ সংযোগের ফলে সারা জীবন তারা মাঝ দরিয়ায় নিজেদের নৌকা একসাথে চালাতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট, কোটি কোটি মানুষ তাদের জীবনে এই যে ভালোবাসা ও দয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করছে এগুলো কোন নিরেট বস্তু নয়। এগুলোকে ওজন ও পরিমাপ

করা যেতে পারে না। মানুষের শারীরিক গঠনে যেসব উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে তাদের মধ্যে কোথাও এদের উৎস চিহ্নিত করা যেতে পারে না। কোন ল্যাবরেটরীতেও এদের জন্ম ও বিকাশ সাধনের কারণসমূহ অনুসন্ধান করা যেতে পারে না। এ ছাড়া এর আর কোন ব্যাখ্যাই করা যেতে পারে না যে, একজন প্রাজ্ঞ স্রষ্টা স্বেচ্ছাকৃতভাবে একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে মানুষের মধ্যে তা সংস্থাপন করে দিয়েছেন।

৩১. অর্থাৎ তাদের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করা, একটি অপরিবর্তনীয় নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং অসংখ্য শক্তির পরম সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য সহকারে কাজ করা—এগুলো নিজের অভ্যন্তরে এ বিষয়ের এমন বহু নিদর্শন রাখে যা থেকে জানা যায় যে, এ সমগ্র বিশ্ব–জাহানকে মাত্র একজন স্রষ্টাই অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই এ বিশাল ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। একদিকে যদি একথা চিন্তা করা যায় যে, এ প্রাথমিক শক্তি (Energy) কোথা থেকে এসে বস্তুর আকার ধারণ করেছে? বস্তুর এ বিভিন্ন উপাদান কেমন করে গঠিত হয়েছে এ উপাদানগুলোকে এহেন বৈজ্ঞানিক কৌশলে সংমিশ্রিত করে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সহকারে এ অত্যদ্ভুত বিশ্বব্যবস্থা গঠিত হয়েছে কেমন করে? এখন কোটি কোটি বছর ধরে একটি মহাপরাক্রমশালী প্রাকৃতিক আইনের আওতাধীনে এ ব্যবস্থাটি কিভাবে চলছে? এ অবস্থায় প্রত্যেক নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে যে, এসব কিছু একজন সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ছাড়া নিছক ঘটনাক্রমে বা অকস্মাত ঘটতে পারে না। আবার অন্যদিকে যদি দেখা যায় যে, পৃথিবী থেকে নিয়ে বিশ্ব–জাহানের দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো পর্যন্ত সবাই একই ধরনের উপাদানে গঠিত এবং একই প্রাকৃতিক আইনের নিয়ন্ত্রণে তারা চলছে, তাহলে হঠকারিতামুক্ত প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিই নিসন্দেহে একথা স্বীকার করবে যে, এ সবকিছু বহু ইলাহর কর্মকুশলতা নয় বরং একজন ইলাহ এ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক।

৩২. অর্থাৎ যদিও তোমাদের বাকশক্তি সমান নয়, মুখ ও জিহবার গঠনেও কোন ফারাক নেই এবং মস্তিষ্কের গঠনাকৃতিও একই রূপ তবুও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তোমাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেছে। তারপর একই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের বিভিন্ন শহর ও জনপদের ভাষাও আলাদা। আবার আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির বলার রীতি, শব্দের উচ্চারণ এবং আলাপ–আলোচনার পদ্ধতি আলাদা। অনুরূপভাবে তোমাদের সৃষ্টি উপাদান এবং তোমাদের গঠনসূত্র একই। কিন্তু তোমাদের বর্ণ এত বেশী বিভিন্ন যে, একেক জাতির কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু একই বাপ–মায়ের দু'টি সন্তানের বর্ণও সম্পূর্ণ একই হয় না। এখানে নমুনা হিসেবে কেবলমাত্র দু'টি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু এদিক দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখুন, দুনিয়ায় সকল দিকেই আপনি এত বেশী বৈচিত্র (VARAITY) দেখতে পাবেন যে, তাদের সবগুলোকে একত্র করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসের যে কোন একটি শ্রেণীকে নেয়া হোক, দেখা যাবে তাদের প্রতিটি এককের মধ্যে মৌলিক একাত্মতা সত্ত্বেও অসংখ্য বিভিন্নতা বিরাজ করছে। এমন কি কোন এক শ্রেণীর একটি এককও অন্য একটি এককের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল নয়। এমন কি একটি গাছের দু'টি পাতার মধ্যেও পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এ জিনিসটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দুনিয়ায় এমন কোন কারখানা নেই যেখানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনপত্র চলছে এবং

বিপুল উৎপাদনের (Massproduction) পদ্ধতিতে সব রকমের জিনিসের এক একটি ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে একই ধরনের জিনিস বের হয়ে আসছে। বরং এখানে এমন একজন জবরদস্ত কারিগর কাজ করছেন যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে পূর্ণ ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগ সহকারে একটি নতুন ডিজাইনে, নতুন নকশায় ও কারুকাজে, নতুন সৌষ্ঠবে এবং নতুন গুণাবলী সহকারে তৈরি করেন। তাঁর তৈরি করা প্রত্যেকটি জিনিস স্বকীয় বৈশিষ্টের অধিকারী। তাঁর উদ্ভাবন ক্ষমতা সবসময় সব জিনিসের একটি নতুন মডেল বের করে চলেছে। তাঁর শিল্পকারিতা একটি ডিজাইনকে দ্বিতীয়বার সামনে নিয়ে আসাকে নিজের পূর্ণতার জন্য অবমাননাকর মনে করে। যে ব্যক্তিই এ বিস্ময়কর দৃশ্য চোখ মেলে দেখবে সে কখনো এ ধরনের মূর্খতা সুলভ ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা একবার এ কারখানাটি চালিয়ে দিয়ে তারপর নিজে কোথাও গিয়ে ঘুমাচ্ছেন, তিনি যে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন এবং নিজের সৃষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিচ্ছেন, এতো একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩৩. অনুগ্রহ সন্ধান করা অর্থ জীবিকার জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালানো। মানুষ যদিও সাধারণত রাতের বেলা ঘুমায় এবং দিনের বেলায় জীবিকার জন্য চেষ্টা–মেহনত করে তবুও শতকরা একশো ভাগ লোক এমনটি করে না। বরং বহুলোক দিনের বেলায় ঘুমায় এবং রাতে জীবিকা উপার্জনের জন্য মেহনত করে। তাই রাত দিনকে একসাথে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দু’টি সময়ে তোমরা ঘুমাও এবং নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টাও চালিয়ে থাকো।

এটিও এমন ধরনের নিদর্শনাবলীর অন্যতম যেগুলো থেকে একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টার ব্যবস্থাপনার সন্ধান পাওয়া যায়। বরং এ ছাড়াও এ জিনিসটি এও চিহ্নিত করে যে, তিনি নিছক স্রষ্টা নন বরং নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি বড়ই করুণাশীল ও স্নেহময় এবং তার প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্য তার চেয়ে বেশী তিনি চিন্তা করেন। মানুষ দুনিয়ায় অনবরত পরিশ্রম করতে পারে না। বরং প্রত্যেকবার কয়েক ঘন্টা মেহনতের পর তাকে কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে হয়। এভাবে আবার সে কয়েক ঘন্টা মেহনত করার শক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে মহাজ্ঞানী ও করুণাময় স্রষ্টা মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র ক্লান্তির অনুভূতি এবং কেবলমাত্র বিশ্রামের আকাংখা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি বরং “নিদ্রা”র এমন একটি জবরদস্ত চাহিদা তার অস্তিত্বের মধ্যে রেখে দিয়েছেন যার ফলে তার ইচ্ছা ছাড়াই এমন কি তার বিরোধিতা সত্ত্বেও আপনা আপনিই কয়েক ঘন্টার জাগরণ ও মেহনতের পর তা তাকে পাকড়াও করে, কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে তাকে বাধ্য করে এবং প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে আপনা আপনিই তাকে ত্যাগ করে। এ নিদ্রার স্বরূপ ও অবস্থা এবং এর মৌল কারণগুলো আজো মানুষ অনুধাবন করতে পারেনি। এটি অবশ্যই জন্মগতভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এবং তার কাঠামোয় রেখে দেয়া হয়েছে। এটি যে যথাযথভাবে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে, এটা একথার সাক্ষ পেশ করার জন্য যথেষ্ট যে, এটি কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং কোন মহাজ্ঞানী সত্তা একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে এ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যে একটি বিরাট জ্ঞান, কল্যাণ ও উদ্দেশ্যমুখীতা পরিষ্কার সক্রিয় দেখা যায়। এ ছাড়াও এ নিদ্রা একথারও সাক্ষবহ যে, যিনি মানুষের মধ্যে এ বাধ্যতামূলক উদ্যোগ রেখে দিয়েছেন তিনি নিজেই মানুষের জন্য তার চেয়ে বেশী

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۴﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত হচ্ছে, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎচমক ভীতি ও লোভ সহকারে।[৩৪] *আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর এর মাধ্যমে জমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।*[৩৫] *অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।*

কল্যাণকামী। অন্যথায় মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নিদ্রার বিরোধিতা করে এবং জোরপূর্বক জেগে থেকে এবং অনবরত কাজ করে কেবল নিজের কর্মশক্তিই নয় জীবনী শক্তিও ক্ষয় করে।

তারপর জীবিকার অন্বেষণের জন্য "আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান" শব্দাবলীর ব্যবহার করার মাধ্যমে নিদর্শনাবলীর অন্য একটি ধারাবাহিকতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যদি পৃথিবী ও আকাশের বিপুল ও অগণিত শক্তি সম্ভারকে জীবিকার কার্যকারণ ও উপায় উপকরণ সৃষ্টি করার কাজে না লাগিয়ে দেয়া হতো এবং পৃথিবীতে মানুষের জন্য জীবিকার অসংখ্য উপায়–উপকরণ সৃষ্টি না করা হতো, তাহলে মানুষ এ জীবিকার সন্ধানইবা কোথায় করতে পারতো। শুধুমাত্র এতটুকুই নয় বরং জীবিকার এ অনুসন্ধান এবং তা উপার্জন এমন অবস্থায়ও সম্ভব হতো না যদি এ কাজের জন্য মানুষকে সর্বাধিক উপযোগী অংগ–প্রত্যংগ এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা না দান করা হতো, কাজেই মানুষের মধ্যে জীবিকা অন্বেষণের যোগ্যতা এবং তার অস্তিত্বের বাইরে জীবিকার উপকরণাদি বিদ্যমান থাকা পরিষ্কারভাবে একজন দয়াশীল ও মর্যাদাবান সত্তার অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। বুদ্ধিবৃত্তি অসুস্থ না হলে কখনো কেউ এ ধারণা করতে পারতো না যে, এ সবকিছু অকস্মাত হয়ে গেছে অথবা এসব বহু ইলাহর ইলাহিত্বের ফল কিংবা কোন নির্দয় অন্ধশক্তি এ অনুগ্রহ ও দানের উৎস।

৩৪. অর্থাৎ তার মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎচমক থেকে তো একদিকে আশা হয় বৃষ্টি হবে এবং মাঠ শস্যে ভরে যাবে। কিন্তু সাথে সাথে এ ভয়ও জাগে যে, কোথাও বিজলী পড়ে বা অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়ে বানের তোড়ে সবকিছু ভাসিয়ে না নিয়ে যায়।

৩৫. এ জিনিসটি একদিকে মৃত্যু পরের জীবনের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে এবং অন্যদিকে এ জিনিসটিই একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আছেন এবং এক আল্লাহই পৃথিবী ও আকাশের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। জমি থেকে যা উৎপন্ন হয় তার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির খাদ্য। এ উৎপাদন নির্ভর করে জমির উর্বরতা ও শস্য উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। আবার এ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের ওপর। সরাসরি জমির ওপর এ বৃষ্টিপাত হতে পারে। অথবা পানির বিশাল ভাণ্ডার জমির উপরিভাগে স্থান লাভ করতে পারে। কিংবা ভূগর্ভস্থ ঝরণা ও কূপের রূপলাভ করতে পারে। অথবা পাহাড়ের ওপর বরফের আকারে জমাট বদ্ধ হয়ে নদ–নদীর সাহায্যে প্রবাহিত হতে পারে। তারপর এ বৃষ্টিপাত আবার নির্ভর করে সূর্যের উত্তাপ, মওসুম পরিবর্তন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖۗ مِّنَ الْاَرْضِ ۖۗ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۲۵﴾ وَلَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَهُوَ الَّذِیْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَیْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۷﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত আছে।[৩৬] তারপর যখনই তিনি পৃথিবী থেকে তোমাদের আহবান জানিয়েছেন তখনই একটি মাত্র আহবানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে।[৩৭] আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছুই আছে সবই তাঁর বান্দা, সবাই তাঁর হুকুমের তাঁবেদার। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই আবার তার পুনরাবর্তন করবেন এবং এটি তাঁর জন্য সহজতর।[৩৮] আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁর গুণাবলী শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

মহাশূন্যের তাপমাত্রা ও শৈত্য, বাতাসের আবর্তন এবং এমন বিদ্যুতের ওপর যা মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। এই সংগে বৃষ্টির পানির মধ্যে এক ধরনের প্রাকৃতিক লবণাক্ততাও সৃষ্টি করে দেয়। পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত এসব বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তারপর এসবের অসংখ্য ও বিচিত্র ধরনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের জন্য সুস্পষ্টভাবে উপযোগী হওয়া এবং হাজার হাজার লাখো লাখো বছর পর্যন্ত এদের পূর্ণ একাত্মতা সহকারে অনবরত সহযোগিতার ভূমিকা পালন করে যেতে থাকা, এ সবকিছু কি নিছক ঘটনাক্রমিক হতে পারে? এ সবকিছু কি একজন স্রষ্টার জ্ঞানবত্তা, তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং শক্তিশালী কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই হয়ে গেছে? এ সবকিছু কি একথার প্রমাণ নয় যে, পৃথিবী, সূর্য, বাতাস, পানি, উত্তাপ ও শৈত্য এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা ও রব একজনই?

৩৬. অর্থাৎ তাঁর হুকুমে একবার অস্তিত্ব লাভ করেছে শুধু এতটুকু নয় বরং তাদের সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাদের মধ্যে একটি বিশাল নির্মাণ কারখানার প্রতিনিয়ত সচল থাকাও তাঁরই হুকুমের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও যদি তার হুকুম তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত না রাখে, তাহলে এ সমগ্র ব্যবস্থা এক নিমেষেই ওলট পালট হয়ে যাবে।

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

তিনি নিজেই তোমাদের জন্য[৩৯] তোমাদের আপন সত্তা থেকে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। তোমাদের যেসব গোলাম তোমাদের মালিকানাধীন আছে তাদের মধ্যে কি এমন কিছু গোলাম আছে যারা আমার দেয়া ধন-সম্পদে তোমাদের সাথে সমান অংশীদার এবং তোমরা তাদেরকে এমন ভয় করো যেমন পরস্পরের মধ্যে সমকক্ষদেরকে ভয় করে থাকো?[৪০]—যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তাদের জন্য আমি এভাবে আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি। কিন্তু এ জালেমরা না জেনে বুঝে নিজেদের চিন্তা-ধারণার পেছনে ছুটে চলছে। এখন আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে পথ দেখাতে পারে?[৪১] এ ধরনের লোকদের কোন সাহায্যকারী হতে পারে না।

৩৭. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালকের পক্ষে তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করে উঠিয়ে নিয়ে আসা তেমন কোন বড় কাজ নয়। এ জন্য তাঁকে কোন বড় রকমের প্রস্তুতি নিতে হবে না। বরং তাঁর মাত্র একটি আহবানেই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ দুনিয়ায় জন্মলাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে জন্ম নেবে তারা সবাই একসাথে পৃথিবীর সকল দিক থেকে বের হয়ে আসতে থাকবে।

৩৮. প্রথমবার সৃষ্টি করাটা যদি তাঁর জন্য কঠিন না হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা কেমন করে ধারণা করতে পারলে যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন হবে? প্রথমবারের সৃষ্টির মধ্যে তো তোমরা সশরীরেই উপস্থিত আছো। তাই এটা যে কঠিন নয় তা তো সুস্পষ্ট। এখন এটি একটি সহজ বুদ্ধির ব্যাপার যে, একবার যিনি কোন একটি জিনিস তৈরি করেন সে জিনিসটি পুনর্বার তৈরি করা তার জন্য তুলনামূলকভাবে আরো অনেক বেশী সহজ হওয়ার কথা।

৩৯. এ পর্যন্ত তাওহীদ ও আখেরাতের বর্ণনা মিলেমিশে চলছিল। এর মধ্যে যেসব নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে তাওহীদের প্রমাণও রয়েছে এবং এ প্রমাণগুলো আখেরাতের আগমন যে অসম্ভব নয় সে কথা প্রমাণ করে। এরপর সামনের দিকে নির্ভেজাল তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

৪০. পৃথিবী ও আকাশ এবং তাদের মধ্যকার যাবতীয় জিনিসের স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, মুশরিকরা একথা স্বীকার করার পর তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহর সার্বভৌম সত্তার গুণাবলী ও ক্ষমতার অংশীদার গণ্য করতো। তাদের কাছে প্রার্থনা করতো তাদের সামনে মানত ও নাযরানা পেশ করতো এবং বন্দেগী ও পূজার অনুষ্ঠান করতো। এসব বানোয়াট শরীকদের ব্যাপারে তাদের মূল আকীদার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় পঠিত "তালবীয়াহ" থেকে। এ সময় তারা বলতো ঃ

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هولك تملكه وماملك

"আমি হাজির আছি, হে আমার আল্লাহ আমি হাজির আছি। তোমার কোন শরীক নেই তোমার নিজের শরীক ছাড়া। তুমি তারও মালিক এবং যা কিছু তার মালিকানায় আছে তারও মালিক তুমি।" (তাবারানী ঃ ইবনে আব্বাস বর্ণিত)

এ আয়াতটিতে মহান আল্লাহ এ শিরকটিই খণ্ডন করছেন। এখানে দৃষ্টান্তটির অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে কখনো আল্লাহরই সৃষ্টি যে মানুষ ঘটনাক্রমে তোমার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে তোমার অংশীদার গণ্য হতে পারে না। কিন্তু তোমরা অদ্ভুত ধান্দাবাজী শুরু করেছো, আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানে আল্লাহর সৃষ্টিকে নির্দ্বিধায় তাঁর সাথে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক গণ্য করছো। এ ধরনের নির্বোধ জনোচিত কথাগুলো চিন্তা করার সময় তোমাদের বুদ্ধি–জ্ঞান কি একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আন নাহ্ল, ৬২ টীকা)

৪১. অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি সহজ–সরল বুদ্ধির কথা নিজেও চিন্তা করে না এবং অন্যের বুঝাবার পরও বুঝতে চায় না তখন তার বুদ্ধির ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়। এরপর এমন প্রত্যেকটি জিনিস, যা কোন নিষ্ঠাবান ও বিবেকবান ব্যক্তিকে সত্যকথা পর্যন্ত পৌঁছাতে সাহায্য করে, তা এ হঠকারী মূর্খতাপ্রিয় ব্যক্তিকে আরো বেশী গোমরাহীতে লিপ্ত করতে থাকে। এ অবস্থাটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে "পথ ভ্রষ্টতা" শব্দের মাধ্যমে। সত্যপ্রিয় মানুষ যখন আল্লাহর কাছে সঠিক পথনির্দেশ লাভের সুযোগ চায় তখন আল্লাহ তার সত্য আকাংখা অনুযায়ী তার জন্য বেশী করে সঠিক পথনির্দেশের কার্যকারণসমূহ সৃষ্টি করে দেন। আর গোমরাহী প্রিয় মানুষ যখন গোমরাহীর ওপর টিকে থাকার জন্য জোর দিতে থাকে তখন আল্লাহ তার জন্য আবার এমন সব কার্যকারণ সৃষ্টি করে যেতে থাকেন যা তাকে বিপথগামী করে দিনের পর দিন সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

কাজেই[৪২] (হে নবী এবং নবীর অনুসারীবৃন্দ) একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এ দীনের[৪৩] দিকে স্থির নিবদ্ধ করে দাও।[৪৪] আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।[৪৫] আল্লাহর তৈরি সৃষ্টি কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না।[৪৬] এটিই পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দীন।[৪৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৪২. এখানে "কাজেই" শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, সত্য যখন তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং তোমরা যখন জানতে পেরেছো এ বিশ্ব–জাহানের ও মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনকর্তা এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয় তখন এরপর অপরিহার্যভাবে তোমাদের কার্যধারা এ ধরনের হওয়া উচিত।

৪৩. কুরআন "দীন" শব্দটিকে যে বিশেষ অর্থে পেশ করছে "দীন" শব্দটি এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে বন্দেগী, ইবাদাত ও আনুগত্য লাভের অধিকার একমাত্র লা–শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এতে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে কাউকে তাঁর সাথে সামান্যতমও শরীক করা যায় না। এখানে মানুষ নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে একথা মেনে নেয় যে, সে তার সমস্ত জীবনে আল্লাহর পথনির্দেশ এবং তাঁর আইন মেনে চলবে।

৪৪. "একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এদিকে স্থির নিবদ্ধ করো" অর্থাৎ এরপর আবার অন্যদিকে ফিরো না। জীবনের জন্য এ পথটি গ্রহণ করে নেবার পর অন্য কোন পথের দিকে দৃষ্টিও দেয়া যাবে না। তারপর তোমাদের চিন্তা–ভাবনা হবে মুসলমানের মতো এবং তোমাদের পছন্দ অপছন্দও হবে মুসলমানদের মতো। তোমাদের মূল্যবোধ ও মানদণ্ড হবে তাই যা ইসলাম তোমাদের দেয়। তোমাদের স্বভাব–চরিত্র এবং জীবন ও কার্যক্রমের ছাঁচ ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী হবে। ইসলাম যে পথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনধারা চালাবার বিধান দিয়েছে তোমাদের সে পথেই নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালিত করতে হবে।

৪৫. অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে এ প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন স্রষ্টা, রব, মাবুদ ও আনুগত্য গ্রহণকারী নেই। এ প্রকৃতির ওপর তোমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া উচিত। যদি স্বেচ্ছাচারীভাবে চলার নীতি অবলম্বন করো তাহলে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর যদি অন্যের বন্দেগীর শিকল নিজের গলায় পরে নাও তাহলেও নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করবে।

এ বিষয়বস্তুটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

ما من مولود يولد الا على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء

"মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী প্রত্যেকটি শিশু আসলে মানবিক প্রকৃতির ওপরই জন্ম লাভ করে। তারপর তার মা–বাপই তাকে পরবর্তীকালে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলে।"

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন প্রত্যেকটি পশুর পেট থেকে পুরোপুরি নিখুঁত ও সুস্থ পশুই বের হয়ে আসে। কোন একটা বাচ্চাও কান কাটা অবস্থায় বের হয়ে আসে না। পরে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলী কুসংস্কারের কারণে তার কান কেটে দেয়।

মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ীতে আর একটি হাদীস আছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ এক যুদ্ধে মুসলমানরা শত্রুদের শিশু সন্তানদেরকেও হত্যা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছে যায়। তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ

ما بال اقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية

"লোকদের কি হয়ে গেছে, আজ তারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং শিশুদেরকেও হত্যা করেছে?"

একজন জিজ্ঞেস করলো, এরা কি মুশরিকদের সন্তান ছিল না? জবাবে তিনি বলেন ঃ

انما خياركم ابناء المشركين

"তোমাদের সর্বোত্তম লোকেরা তো মুশরিকদেরই আওলাদ।" তারপর বলেন ঃ

كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانها فابواها يهودانها او ينصرانها –

"প্রত্যেক প্রাণসত্তা প্রকৃতির ওপর জন্ম নেয়, এমনকি যখন কথা বলতে শেখে তখন তার বাপ–মা তাকে ইহুদী খৃষ্টানে পরিণত করে।"

অন্য একটি হাদীসে ইমাম আহমাদ (র) ঈযায ইবনে হিমার আল মুজাশি'য়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ভাষণের মাঝখানে বলেন ঃ

ان ربى يقول انى خلقت عبادى حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم انزل به سلطانا –

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

(প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও একথার ওপর) আল্লাহ অভিমুখী হয়ে[৪৮] এবং তাঁকে ভয় করো,[৪৯] আর নামায কায়েম করো[৫০] এবং এমন মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেয়ো না যারা নিজেদের আলাদা আলাদা দীন তৈরি করে নিয়েছে আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তাতেই তারা মশগুল হয়ে আছে।[৫১]

"আমার রব বলেন, আমার সমস্ত বান্দাদেরকে আমি একনিষ্ঠ সত্যপথাশ্রয়ী করে সৃষ্টি করেছিলাম, তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে দীন থেকে বিপথগামী করে এবং তাদের জন্য আমি যা কিছু হালাল করে দিয়েছিলাম সেগুলোকে হারাম করে নেয় এবং তাদেরকে হুকুম দেয়, আমার সাথে এ জিনিসগুলোকে শরীক গণ্য করো, যেগুলোকে শরীক করার জন্য আমি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি।"

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে নিজের বান্দায় পরিণত করেছেন। কেউ চাইলেও এ কাঠামোয় কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ বান্দা থেকে অ–বান্দা হতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে নিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মানুষের ইলাহ হতে পারে না। মানুষ নিজের জন্য যতগুলো উপাস্য তৈরি করে নিক না কেন, মানুষ যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় এ বাস্তব সত্যটি অকাট্য ও অবিচল রয়ে গেছে। মানুষ নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে যাকে ইচ্ছা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার ধারক গণ্য করতে পারে এবং যাকে চায় তাকে নিজের ভাগ্য ভাঙা–গড়ার মালিক মনে করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ও বাস্তব সত্য এটিই যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। কেউ তাঁর মতো ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং মানুষের ভাগ্য ভাঙা–গড়ার শক্তিও আল্লাহ ছাড়া কারো নেই।

এ আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "আল্লাহর তৈরি কাঠামোয় পরিবর্তন করা যাবে না।" অর্থাৎ আল্লাহ যে প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাকে বিকৃত করা ও ভেঙে ফেলা উচিত নয়।

৪৭. অর্থাৎ শান্ত সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই সঠিক ও সহজ পথ।

৪৮. আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তিই স্বেচ্ছাচারিতার নীতি অবলম্বন করে নিজের প্রকৃত মালিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা যে ব্যক্তিই অন্যের বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে নিজের প্রকৃত রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার এ নীতি

পরিহার করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে যে আল্লাহর বান্দা হিসেবে সে জন্মলাভ করেছে সেই এক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে তাকে ফিরে যেতে হবে।

৪৯. অর্থাৎ তোমাদের মনে এ ভয় জাগরুক থাকতে হবে যে, যদি আল্লাহর জন্মগত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তার মোকাবিলায় স্বাধীনতার নীতি অবলম্বন করে থাকো, অথবা তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো বন্দেগী করে থাকো, তাহলে এ বিশ্বাসঘাতকতা ও নিমকহারামির জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই তোমাদের এমন নীতি ও মনোভাব থেকে দূরে থাকা উচিত যা তোমাদের জন্য আল্লাহর আযাব ভোগ করাকে অবধারিত করে তোলে।

৫০. আল্লাহর দিকে ফেরা এবং তাঁর গযবের ভয় করা—এ দু'টিই মানসিক কর্ম। এ মানসিক অবস্থাটির প্রকাশ এবং এর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্যভাবে এমন কোন দৈহিক কর্মের প্রয়োজন যার মাধ্যমে বাইরেও প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে ওমুক ব্যক্তি যথার্থই এক ও লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে এসেছে। মানুষের নিজের মনের মধ্যেও এ আল্লাহ ভীতির দিকে ফিরে আসার অবস্থাটি একটি কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনবরত বিকাশ লাভ করতে থাকবে। তাই মহান আল্লাহ এই মানসিক পরিবর্তনের হুকুম দেবার পর সাথে সাথেই এ দৈহিক কর্ম অর্থাৎ নামায কায়েম করার হুকুম দেন। মানুষের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন চিন্তা নিছক চিন্তার পর্যায়েই থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয় না। এ চিন্তায় ভাটা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে এবং চিন্তায় পরিবর্তন আসারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন সে সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তখন তার মধ্যে এ চিন্তা শিকড় গেড়ে বসে যেতে থাকে এবং যতই সে তদনুযায়ী কাজ করতে থাকে ততই তার শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা বেড়ে যেতে থাকে। এমনকি এ আকীদা ও চিন্তা পরিবর্তিত হওয়া এবং এতে ভাটা পড়ে যাওয়া ক্রমেই দুষ্কর হয়ে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া এবং আল্লাহ ভীতিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার চাইতে বেশী কার্যকর আর কোন কাজ নেই। কারণ অন্য যে কোন কাজই হোক না কেন তা বিলম্বে আসে অথবা নামায এমন একটি কাজ যা নিয়মিতভাবে কয়েক ঘন্টা পরপর একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে মানুষকে স্থায়ীভাবে পালন করতে হয়। কুরআন ঈমান ও ইসলামের পূর্ণাংগ যে পাঠ মানুষকে দিয়েছে তা যাতে সে ভুলে না যায় এ জন্য বারবার মানুষকে তার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তাছাড়া মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কারা বিদ্রোহের নীতি পরিহার করে রবের প্রতি আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছে, কাফের ও মুমিন সমাজ উভয়ের সামনে একথা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। মু'মিনদের কাছে একথা এ জন্য প্রকাশ হওয়া দরকার যে, এর ফলে তাদের একটি সমাজ ও দল গঠিত হতে পারে। তারা আল্লাহর পথে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে। ঈমান ও ইসলামের সাথে যখনই তাদের দলের কোন ব্যক্তির সম্পর্ক ঢিলা হয়ে যেতে থাকে তখনই কোন সুস্পষ্ট আলামত সংগে সংগেই সমগ্র মু'মিন সমাজকে তার অবস্থা জানিয়ে দেয়। কাফেরদের কাছে এর প্রকাশ হওয়া এ জন্য প্রয়োজন যে, এর ফলে তাদের হৃদয় অভ্যন্তরে ঘুমিয়ে থাকা প্রকৃতি তার নিজের শ্রেণী মানুষদেরকে আসল ইলাহ রব্বুল আলামীনের দিকে বারবার ফিরে আসতে দেখে জেগে উঠবে এবং যতক্ষণ তারা জাগবে না ততক্ষণ আল্লাহর অনুগতদের কর্ম তৎপরতা দেখে তাদের মধ্যে ভীতি ও

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোন কষ্ট পায় তখন নিজেদের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকতে থাকে[৫২] তারপর যখন তিনি নিজের দয়ার কিছু স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান তখন সহসা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়,[৫৩] যাতে আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। বেশ, ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি কি তাদের কাছে কোন প্রমাণপত্র ও দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের শিরকের সত্যতার সাক্ষ দেয়?[৫৪]

আতংক সৃষ্টি হতে থাকবে। এ দু'টি উদ্দেশ্যের জন্যও নামায কায়েম করাই হবে সবচেয়ে বেশী উপযোগী মাধ্যম।

এ প্রসংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, নামায কায়েম করার এ হুকুমটি মক্কা মু'আযযমায় এমন এক যুগে দেয়া হয় যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানের ক্ষুদ্র দলটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের জুলুম ও নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল এবং এরপরও ন' বছর পর্যন্ত এ নিষ্পেষণের ধারা অব্যাহত ছিল। সে সময় দূরের কোথাও ইসলামী রাষ্ট্রের নাম নিশানা ছিল না। যদি ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া নামায অর্থহীন হয়ে থাকে, যেমন কতিপয় নাদান মনে করে থাকেন, অথবা ইকামতে সালাত অর্থ আদতে নামায কায়েম করা না হয়ে থাকে বরং "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" পরিচালনা হয়ে থাকে, যেমন হাদীস অস্বীকারকারীরা দাবী করে থাকেন, তাহলে এ অবস্থায় কুরআন মজীদের এ ধরনের হুকুম দেয়ার অর্থ কি? আর এ হুকুম আসার পর ৯ বছর পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা এ হুকুমটি কিভাবে পালন করতে থাকেন?

৫১. ওপরে যে প্রাকৃতিক দীনের কথা বলা হয়েছে মানব জাতির আসল দীনই হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক দীন, এখানে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। এ দীন মুশরিকী ধর্ম থেকে ক্রম–বিবর্তনের মাধ্যমে তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছেনি। যেমন আন্দাজ অনুমানের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় দর্শন রচনাকারীরা মনে করে থাকেন। বরং দুনিয়ায় যতগুলো ধর্ম পাওয়া যায় এ সবেরই উৎপত্তি হয়েছে এ আসল দীনের মধ্যে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে। এ বিকৃতি আসার কারণ হলো এই যে, বিভিন্ন ব্যক্তি প্রাকৃতিক সত্যের ওপর নিজেদের নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জন্য এক একটি আলাদা ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই মূল সত্যের পরিবর্তে এ বর্ধিত জিনিসেরই ভক্ত অনুরক্ত হয়ে গেছে। যার ফলে তারা

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

যখন আমি লোকদেরকে দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সহসা তারা হতাশ হয়ে যেতে থাকে।[৫৫] *এরা কি দেখে না আল্লাহই যাকে চান তার রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং সংকীর্ণ করেন (যাকে চান)? অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শনাবলী এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।*[৫৬]

অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র ফিরকায় পরিণত হয়েছে। এখন সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করতে চাইলে যে প্রকৃত সত্য ছিল সত্য দীনের মূল ভিত্তি, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেদিকে ফিরে যেতে হবে। পরবর্তীকালের যাবতীয় বর্ধিত অংশ থেকে এবং তাদের ভক্ত–অনুরক্তদের দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারেই আলাদা হয়ে যেতে হবে। তাদের সাথে তারা যে সম্পর্ক সূত্রই কায়েম রাখবে সেটিই তাদের দীনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হবে।

৫২. তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে তাওহীদের প্রমাণ রয়ে গেছে একথাটিই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেসব সহায়কের ভিত্তিতে আশার প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল যখনই সেগুলো ভেঙে পড়তে থাকে তখনই তাদের অন্তর ভেতর থেকেই স্বতস্ফূর্তভাবে এই বলে চিৎকার করতে থাকে যে, বিশ্ব–জাহানের মালিকই আসল শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী এবং তাঁরই সাহায্যে তারা নিজেদের ধ্বংসরোধ ও ক্ষতিপূরণ করতে পারে।

৫৩. অর্থাৎ অন্যান্য উপাস্যদেরকে মানত ও নযরানা পেশ করার কাজ শুরু হয়ে যায়। এই সংগে একথাও বলা হতে থাকে যে, ওমুক হযরতের বদৌলতে এবং ওমুক মাজারের অনুগ্রহে এ বিপদ সরে গেছে।

৫৪. অর্থাৎ কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে তারা একথা জানতে পারলো যে, আপদ–বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেন না বরং এসব বানোয়াট উপাস্যরা রক্ষা করে থাকে? বুদ্ধিবৃত্তি কি এর সাক্ষ দেয়? অথবা আল্লাহর এমন কোন কিতাব আছে কি যার মধ্যে তিনি বলেছেন, আমি আমার সার্বভৌম কর্তৃত্ব অমুক অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দিয়েছি, এখন থেকে তারাই তোমাদের সমস্ত কাজ করে দেবে?

৫৫. ওপরের আয়াতে মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা, এবং তার অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে পাকড়াও করা হয়েছিল। এ আয়াতে মানুষের হীন প্রবৃত্তি ও তার সংকীর্ণমনতার জন্য তাকে পাকড়াও করা হয়েছে। এ হীনচেতা কাপুরুষটি যখন

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

কাজেই (হে মু'মিন!) আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে (দাও তাদের অধিকার)।[৫৭] এ পদ্ধতি এমন লোকদের জন্য ভালো যারা চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তারাই সফলকাম হবে।[৫৮] যে সূদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না।[৫৯] আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।[৬০]

দুনিয়ায় কিছু ধন–সম্পদ, শক্তি ও মর্যাদা লাভ করে এবং দেখে তার কাজ খুব ভালোভাবে চলছে তখন এ সবকিছু যে মহান আল্লাহর দান, একথা আর তার একদম মনে থাকে না। তখন সে মনে করতে থাকে, তার মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে যার ফলে সে এমন কিছু লাভ করেছে যা থেকে অন্যোরা বঞ্চিত হয়েছে। এ বিভ্রান্তির মধ্যে অহংকার ও আত্মগরিমার নেশায় সে এমনই বিভোর হয়ে যায় যার ফলে সে আল্লাহ ও সৃষ্টি কাউকেও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না। কিন্তু যখনই সৌভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং দুর্ভাগ্যের একটিমাত্র আঘাতই তার হৃদয়বৃত্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়। তখন এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, হীনতম কাজ করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যাও করে বসে।

৫৬. অর্থাৎ মানুষের নৈতিক চরিত্রের ওপর কুফরী ও শিরক কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং এর বিপরীত পক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমানের নৈতিক পরিণাম কি, মু'মিনরা এ থেকে সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তিই নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকেই রিযিকের সমুদয় ভাণ্ডারের মালিক মনে করে, সে কখনো আল্লাহকে ভুলে থাকা লোকদের মতো সংকীর্ণ হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিতে পারে না। সে প্রসারিত রিযিক লাভ করলে অহংকারে মত্ত হয় না। বরং আল্লাহর শোকর আদায় করে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতা ও ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না। সংকীর্ণ জীবিকা লাভ করুক বা অনাহারে থাকুক সর্বাবস্থায় সে সবর করে, কখনো বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয় না এবং শেষ সময় পর্যন্ত আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের আশায় বসে থাকে। কোন নাস্তিক বা মুশরিক এ নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।

৫৭. আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরকে দান-খয়রাত করার কথা বলা হয়নি। বরং বলা হচ্ছে, এ তার অধিকার এবং অধিকার মনে করেই তোমাদের এটা দেয়া উচিত। এ অধিকার দিতে গিয়ে যেন তোমার মনে এ ধারণা না জন্মে যে, তার প্রতি তুমি অনুগ্রহ করছো এবং তুমি কোন মহান দানশীল সত্তা আর সে কোন একটি সামান্য ও নগণ্য সৃষ্টি, তোমার অনুগ্রহের কণা ভক্ষণ করেই সে জীবিকা নির্বাহ করে। বরং একথা ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে যাওয়া উচিত যে, সম্পদের আসল মালিক যদি তোমাকে বেশী এবং অন্য বান্দাদেরকে কম দিয়ে থাকেন, তাহলে এ বর্ধিত সম্পদ হচ্ছে এমন সব লোকের অধিকার যাদেরকে তোমার আওতাধীনে তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য দেয়া হয়েছে। তুমি তাদেরকে এ অধিকার দান করছো কি করছো না এটা তোমার মালিক দেখতে চান।

আল্লাহর এ ভাষণ এবং এর আসল প্রাণসত্ত্বা সম্পর্কে যে ব্যক্তিই চিন্তা-ভাবনা করবে সে একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, কুরআন মজীদ মানুষের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যে পথ নির্ধারণ করে সে জন্য একটি মুক্ত সমাজ ও মুক্ত অর্থনীতি (Free Economy) অপরিহার্য। এ উন্নতি এমন কোন সামাজিক পরিবেশে সম্ভবপর নয় যেখানে মানুষের মালিকানা অধিকার খতম করে দেয়া হয়, রাষ্ট্র সমস্ত উৎপাদন উপকরণের একচ্ছত্র মালিক হয়ে যায় এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জীবিকা বন্টনের যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারী কর্মকর্তাদের করায়ত্ব থাকে। এমন কি কোন ব্যক্তি নিজের ওপর অন্যের কোন অধিকার চিহ্নিত করার পরও তা তাকে দিতে পারে না এবং অন্য ব্যক্তি কারো থেকে কিছু গ্রহণ করে তার জন্য নিজের মনের মধ্যে কোন শুভেচ্ছার অনুভূতি লালন করতে পারে না। এভাবে নির্ভেজাল কমিউনিষ্ট সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আজকাল আমাদের দেশে "কুরআনী রবুবীয়াত ব্যবস্থা"র গালভরা নাম দিয়ে জবরদস্তি কুরআনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এটা কুরআনের নিজস্ব পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত নৈতিক বৃত্তির বিকাশ ও উন্মেষ এবং ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও উন্নয়নের দুয়ার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। কুরআনের পরিকল্পনা এমন জায়গায় কার্যকর হতে পারে যেখানে ব্যক্তিরা সম্পদের কিছু উপায়-উপকরণের মালিক হয়, সেগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে এবং এরপর স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আন্তরিকতা সহকারে প্রদান করে। এ ধরনের সমাজে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে একদিকে সহানুভূতি, দয়া-মায়া, মমতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সত্যনিষ্ঠা ও সত্য পালন করার উন্নততর গুণাবলী সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং অন্যদিকে যেসব লোকের সাথে সদাচার করা হয় তাদের মনে সদাচারীদের জন্য শুভেচ্ছা ও অনুগৃহীত হবার মনোভাব এবং অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করার পবিত্র অনুভূতি বিকাশ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি আদর্শ ও মহৎ পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে যায় যেখানে অন্যায়ের পথ রুদ্ধ হওয়া এবং ন্যায়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া কোন স্বৈরাচারী শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয় না বরং লোকেরা নিজেদের আত্মিক শুদ্ধতা ও সদিচ্ছাবশেই এ দায়িত্ব মাথা পেতে নেয়।

৫৮. এর দ্বারা একথা বুঝানো হচ্ছে না যে, কেবলমাত্র মিসকীন, মুসাফির ও আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার দিয়ে দিলেই সাফল্য লাভ করা যাবে এবং এ ছাড়া সাফল্য লাভ করার জন্য আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যেসব লোক এ

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহই[৬১] তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন।[৬২] তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন, এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এ কাজও করে?[৬৩] পাক–পবিত্র তিনি এবং এরা যে শির্‌ক করে তার বহু উর্ধে তাঁর অবস্থান।

অধিকারগুলো জানে না এবং এগুলো প্রদান করে না তারা সাফল্য লাভ করবে না। বরং সাফল্য লাভ করবে এমনসব লোক যারা একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অধিকারগুলো জানে এবং এগুলো প্রদান করে।

৫৯. সুদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনসূচক কুরআনের এটিই প্রথম আয়াত। এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে যে, তোমরা তো একথা মনে করে সুদ দিয়ে থাকো যে, যাকে আমি এ অতিরিক্ত সম্পদ দিচ্ছি তার ধন–দওলত বেড়ে যাবে। কিন্তু আসলে আল্লাহর কাছে সুদের মাধ্যমে ধন–দওলত বৃদ্ধি হয় না বরং যাকাতের মাধ্যমে বৃদ্ধি হয়। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে যখন মদীনা তাইয়েবায় সুদ হারাম হবার হুকুম নাযিল করা হয় তখন সেখানে অতিরিক্ত একথা বলা হয়, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ "আল্লাহ সুদকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং সাদকাকে বিকশিত করেন।" (পরবর্তী বিধানের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান, ১৩০ আয়াত এবং আল বাকারাহ, ২৭৫ থেকে ২৮১ আয়াত)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল বলেন, এখানে রিবা শব্দের মাধ্যমে এমন সুদের কথা বলা হয়নি যাকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম করা হয়েছে বরং এমন ধরনের দান, তোহ্‌ফা ও হাদিয়াকে সুদ বলা হয়েছে যা গ্রহীতা পরবর্তীকালে ফেরত দেবার সময় তা বর্ধিত আকারে ফেরত দেবে, এরূপ সংকল্প সহকারে দেয়া হয়। অথবা একথা মনে করে দেয়া হয় যে, তা দাতার কোন ভালো কাজে লাগবে অথবা তার আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করা দাতার নিজের জন্য ভালো হবে। এটি ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রা), দ্বাহ্‌হাক (রা), কাতাদাহ, ইকরামাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী ও শা'বীর উক্তি। আর সম্ভবত তাঁরা এ ব্যাখ্যা এ জন্য করেছেন যে, আয়াতে এ কর্মের ফল হিসেবে কেবলমাত্র এতটুকু বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে এ সম্পদের মধ্যে কোন বৃদ্ধি হবে না। অথচ শরীয়াত যে সুদকে হারাম করে দিয়েছে যদি ব্যাপারটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট হতো তাহলে ইতিবাচকভাবে বলা হতো, আল্লাহর দরবারে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, না, শরীয়াত যে রিবাকে হারাম গণ্য করেছে এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। এ মত প্রকাশ করেছেন হযরত হাসান বাসরী ও সুদ্দী এবং আল্লামা আলূসীর

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

৫ রুকূ'

*মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে–স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা বিরত হবে।*৬৪ *(হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে দেখো পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।*৬৫

মতে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটিই। কারণ আরবী ভাষায় রিবা শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মুফাস্‌সির নিশাপুরীও এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন।

আমার মতেও এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই সঠিক। কারণ পরিচিত অর্থ পরিত্যাগ করার জন্য ওপরে প্রথম ব্যাখ্যার সপক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। সূরা রূম যে সময় নাযিল হয় সে সময় কুরআন মজীদ সুদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেনি। তার কয়েক বছর পর একথা ঘোষিত হয়। এ জন্য সে পূর্ব থেকেই মন–মানসিকতা তৈরি করার কাজে লিপ্ত হয়। মদের ব্যাপারেও পূর্বে শুধুমাত্র এতটুকু বলা হয়েছিল যে, এটা পবিত্র রিযিক নয় (আন্‌ নাহ্‌ল, ৬৭ আয়াত)। তারপর বলা হয়, এর ক্ষতি এর লাভের চেয়ে বেশী (আল বাকারাহ, ২১৯)। এরপর হুকুম দেয়া হয়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছে যেয়ো না (আন নিসা ৪৩)। তারপর এটিকে পুরোপুরি হারাম করার ঘোষণা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে এখানে সুদের ব্যাপারেও কেবলমাত্র এতটুকু বলেই থেমে যাওয়া হয়েছে যে, এটা এমন জিনিস নয় যার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি হয় বরং সম্পদ প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি হয় যাকাতের মাধ্যমে। এরপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে (আলে ইমরান, ১৩০) এবং সবশেষে সুদকেই চূড়ান্তভাবে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে (আল বাকারাহ, ২৭৫)

৬০. এ বৃদ্ধির কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। যে ধরনের ঐকান্তিক সংকল্প, গভীর ত্যাগের অনুভূতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের প্রবল আকাংখা সহকারে কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে অনুরূপভাবেই আল্লাহ তাকে বেশী বেশী প্রতিদানও দেবেন। তাই একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি খেজুরও দান করে তাহলে আল্লাহ তাকে বাড়িয়ে ওহোদ পাহাড়ের সমান করে দেন।

৬১. এখান থেকে আবার মুশরিকদেরকে বুঝাবার জন্য বক্তব্যের ধারা তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে এসেছে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

কাজেই (হে নবী!) এই সত্য দীনে নিজের চেহারাকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করো আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিনের হটে যাওয়ার কোন পথ নেই তার আগমনের পূর্বে,[৬৬] সেদিন লোকেরা বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। যে কুফরী করেছে তার কুফরীর শাস্তি সে-ই ভোগ করবে[৬৭] আর যারা সৎকাজ করেছে তারা নিজেদেরই জন্য সাফল্যের পথ পরিষ্কার করছে, যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। অবশ্যই তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

৬২. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের রিযিকের জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন এবং এমন ব্যবস্থা করেছেন যার ফলে রিযিকের আবর্তনের মাধ্যমে প্রত্যেকে কিছু না কিছু অংশ পেয়ে যায়।

৬৩. অর্থাৎ তোমাদের তৈরি করা উপাস্যদের মধ্যে কেউ কি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা? জীবন ও মৃত্যু দান করা কি কারো ক্ষমতার আওতাভুক্ত আছে? অথবা মরার পর সে আবার কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে? তাহলে তাদের কাজ কি? তোমরা তাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন?

৬৪. এখানে আবার রোম ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল এবং যার আগুন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। "লোকদের স্বহস্তের উপার্জন" বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, ফাসেকী, অশ্লীলতা, জুলুম ও নিপীড়নের এমন একটি ধারা যা শিরক ও নাস্তিক্যবাদের আকীদা-বিশ্বাস অবলম্বন ও আখেরাতকে উপেক্ষা করার ফলে অনিবার্যভাবে মানবিক নৈতিক গুণাবলী ও চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। "হয়তো তারা বিরত হবে" এর অর্থ হচ্ছে, আখেরাতে শাস্তি লাভ করার পূর্বে আল্লাহ এ দুনিয়ায় মানুষের সমস্ত নয় বরং কিছু খারাপ কাজের ফল এ জন্য ভোগ করান যে, এর ফলে সে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবে এবং নিজের চিন্তাধারার ভ্রান্তি অনুধাবন করে নবীগণ সবসময় মানুষের সামনে যে সঠিক বিশ্বাস উপস্থাপন করে এসেছেন এবং যা গ্রহণ না করলে মানুষের কর্মধারাকে সঠিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই সেদিকে ফিরে আসবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে, এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে এই যে, তিনি বাতাস পাঠান সুসংবাদ দান করার জন্য[৬৮] এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে আপ্লুত করার জন্য। আর এ উদ্দেশ্যে যাতে নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে চলে[৬৯] এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো[৭০] আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমি তোমার পূর্বে রসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই এবং তাঁরা তাদের কাছে আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[৭১] তারপর যারা অপরাধ করে[৭২] তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিই আর মু'মিনদেরকে সাহায্য করা ছিল আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

যেমন দেখুন, আত্ তাওবা, ১২৬; আর রা'আদ, ২১; আস্ সাজদাহ, ২১ এবং আত তূর, ৪৭ আয়াত।

৬৫. অর্থাৎ রোম ও ইরানের ধ্বংসকর যুদ্ধ আজ কোন নতুন দুর্ঘটনা নয়। বড় বড় জাতিসমূহের ধ্বংসের কাহিনী অতীত ইতিহাসের বিরাট অংশ জুড়ে আছে। আর যে দোষগুলো সেসব জাতির ধ্বংসের মূলে কাজ করেছে সেগুলোর মূলে ছিল এ শিরক এবং আজ এ শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ নিজে যাকে হটাবেন না এবং তিনি কারো জন্য এমন কোন তদবির করার অবকাশও রাখেননি যার ফলে তা হটে যেতে পারে।

৬৭. এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। একজন কাফের নিজের কুফরীর কারণে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এ বাক্যের মধ্যে তার সবগুলোরই সমাবেশ ঘটেছে। ক্ষতিকারক বস্তুর অন্য কোন বিস্তারিত তালিকাই এতটা ব্যাপক হতে পারে না।

৬৮. অর্থাৎ অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণের সুসংবাদ দেবার জন্য।

৬৯. এটি জাহাজ চলাচলে সহায়তা দানকারী অন্য এক ধরনের বাতাসের আলোচনা। প্রাচীনকালে বাতাসের সহায়তায় চলাচলকারী নৌযান ও জাহাজসমূহের সফর তো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অনুকূল বাতাসের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। প্রতিকূল বাতাস তাদের জন্য ছিল ধ্বংসের সূচনা। তাই বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের পর ঐ বাতাসের উল্লেখ করা হয়েছে একটি বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে।

ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ ۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

আল্লাহই বাতাস পাঠান ফলে তা মেঘ উঠায়, তারপর তিনি এ মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবেই চান সেভাবে এবং তাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, তারপর তুমি দেখো বারিবিন্দু মেঘমালা থেকে নির্গত হয়েই চলছে। এ বারিধারা যখন তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর চান বর্ষণ করেন তখন তারা আনন্দোৎফুল্ল হয়। অথচ তার অবতরণের পূর্বে তারা হতাশ হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহের ফলগুলো দেখো, মৃত পতিত ভূমিকে তিনি কিভাবে জীবিত করেন,[৭৩] অবশ্যই তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

৭০. অর্থাৎ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সফর করো।

৭১. অর্থাৎ এক ধরনের নিদর্শনাবলী তো বিশ্ব-প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কাজে কর্মে প্রায় সর্বত্রই সেগুলোর সাথে মানুষের সংযোগ ঘটে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা। ওপরের আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য এক ধরনের নিদর্শনাবলী আল্লাহর নবীগণ মু'জিযা, আল্লাহর বাণী, নিজেদের অসাধারণ পবিত্র চরিত্র এবং মানব সমাজে নিজেদের জীবনদায়ী প্রভাবের আকারে নিয়ে এসেছেন। এ দু'ধরনের নিদর্শন আসলে একটি সত্যের প্রতিই ইংগিত করে। তা হচ্ছে, নবীগণ যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই সঠিক। তার মধ্যে প্রত্যেকটি নিদর্শনই অন্যটির সমর্থক। বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী নবীগণের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করে এবং নবীগণ যেসব নিদর্শন এনেছেন সেগুলো বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী যে সত্যের প্রতি ইংগিত করছে সেগুলোকে উন্মুক্ত করে দেয়।

৭২. অর্থাৎ এ দু'টি নিদর্শন থেকে চোখ বন্ধ করে তাওহীদ অস্বীকার করার ওপর অবিচল থাকে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করে যেতে থাকে।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

আর যদি আমি এমন একটি বাতাস পাঠাই যার প্রভাবে তারা দেখে তাদের শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে[৭৪] তাহলে তো তারা কুফরী করতে থাকে।[৭৫] (হে নবী!) তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না,[৭৬] এমন বধিরদেরকেও নিজের আহবান শুনাতে পারো না যারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে[৭৭] এবং অন্ধদেরকেও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বের করে সঠিক পথ দেখাতে পারো না।[৭৮] তুমি তো একমাত্র তাদেরকেই শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং আনুগত্যের শির নত করে।

৭৩. এখানে যেভাবে একের পর এক নবুওয়াত ও বৃষ্টির আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এ সত্যটির প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও পাওয়া যায় যে, নবীর আগমনও মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য ঠিক তেমনি অনুগ্রহস্বরূপ যেমন বৃষ্টির আগমন তার বৈষয়িক জীবনের জন্য অনুগ্রহ হয়ে দেখা দেয়। আকাশ থেকে বারিধারা নেমে আসার ফলে যেমন মৃত পতিত জমি অকস্মাত জীবিত হয়ে ওঠে এবং তার চতুর্দিক শস্য শ্যামলিমায় ভরে যায়, ঠিক তেমনি আসমানী অহী অবতীর্ণ হওয়ার ফলে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরাণ দুনিয়া সজীব হয়ে ওঠে এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও প্রশংসিত আচার আচরণের উদ্যানগুলো পত্র–পুষ্পে সুশোভিত হতে থাকে। এটা কাফেরদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিয়ামত যখনই তাদের কাছে আসে, তারা তা অস্বীকার করে এবং তাকে নিজেদের জন্য রহমতের সুসংবাদ মনে করার পরিবর্তে মৃত্যুর বারতা মনে করতে থাকে।

৭৪. অর্থাৎ রহমতের বারিধারার পরে যখন শস্যক্ষেত সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে তখন যদি এমন কোন কঠিন শৈত্য বা উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ চলে, যার ফলে পাকা শস্য একেবারে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

৭৫. অর্থাৎ তখন তারা আল্লাহর কুৎসা গাইতে এবং তাঁকে দোষারোপ করতে থাকে এই বলে যে, আমাদের ওপর এ কেমন বিপদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ যখন আল্লাহ তাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহধারা বর্ষণ করে চলছিলেন তখন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তাঁর অমর্যাদা করেছিল। এখানে আবার এ বিষয়বস্তুর প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহর রসূল তাঁর পক্ষ থেকে রহমতের পয়গাম নিয়ে আসেন

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ڏ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۭ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۡ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৬ রুকূ'

আল্লাহই দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর এ দুর্বলতার পরে তোমাদের শক্তি দান করেন, এ শক্তির পরে তোমাদেরকে আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দেন; তিনি যা চান সৃষ্টি করেন।[৭৯] আর তিনি সবকিছু জানেন, সব জিনিসের ওপর তিনি শক্তিশালী। আর যখন সেই সময় শুরু হবে,[৮০] যখন অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমরা তো মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করিনি।[৮১] এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে প্রতারিত হতো।[৮২] কিন্তু যাদেরকে ঈমান ও জ্ঞানের সম্পদ দান করা হয়েছিল তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর লিখিত বিধানে হাশরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছো, কাজেই এটিই সেই হাশরের দিন কিন্তু তোমরা জানতে না। কাজেই সেদিন জালেমদের কোন ওজর-আপত্তি কাজে লাগবে না এবং তাদেরকে ক্ষমা চাইতেও বলা হবে না।[৮৩]

তখন লোকেরা তাঁর কথা মেনে নেয় না এবং সেই নিয়ামত প্রত্যাখ্যান করে। তারপর যখন তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ জালেম ও স্বৈরাচারী একনায়কদেরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেন এবং তারা জুলুম-নিপীড়নের যাঁতাকলে তাদেরকে পিষ্ট করতে এবং মানবতার নিকুচি করতে থাকে তখন তারাই আল্লাহকে গালি দিতে থাকে এবং তিনি এ কেমন জুলুমে পরিপূর্ণ দুনিয়া তৈরি করেছেন বলে দোষারোপও করতে থাকে।

৭৬. এখানে এমনসব লোককে মৃত বলা হয়েছে। যাদের বিবেক মরে গেছে, যাদের মধ্যে নৈতিক জীবনের ছিটেফোঁটাও নেই এবং যাদের আপন প্রবৃত্তির দাসত্ব, জিদ ও

একগুঁয়েমি সেই মানবীয় গুণপনার অবসান ঘটিয়েছে যা মানুষকে হক কথা বুঝার ও গ্রহণ করার যোগ্য করে তোলে।

৭৭. বধির হচ্ছে এমনসব লোক যারা নিজেদের মনের দুয়ার এমনভাবে অর্গলবদ্ধ করেছে যে, সবকিছু শুনেও তারা কিছুই শুনে না। তারপর এ ধরনের লোকেরা যখন এমন প্রচেষ্টাও চালায় যাতে সত্যের আহবানের ধ্বনি তাদের কানে পৌছুতেই না পারে এবং আহবায়কের চেহারা দেখতেই দূরে সরে যেতে থাকে তখন আর কে তাদেরকে শুনাবে এবং কী–ই বা শুনাবে?

৭৮. অর্থাৎ অন্ধদের হাত ধরে তাদেরকে সারা জীবন সঠিক পথে চালানো তো নবীর কাজ নয়। তিনি তো কেবল সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যাদের দেখার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে এবং নবী তাদেরকে যে পথ দেখাতে চাচ্ছেন তা যারা দেখতেই পায় না তাদেরকে পথ দেখানোর ক্ষমতা নবীর নেই।

৭৯. অর্থাৎ শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। এসব অবস্থা তাঁরই সৃষ্ট। তিনি যাকে চান দূর্বল করে সৃষ্টি করেন, যাকে চান তাকে শক্তিশালী করেন, যাকে চান তাকে শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করতে দেন না, যাকে চান তাকে যৌবনে মৃত্যু দান করেন, যাকে চান তাকে দীর্ঘ বয়স দান করার পরও সুস্থ সবল রাখেন, যাকে চান তাকে গৌরবান্বিত যৌবনকালের পরে বার্ধক্যে এমন কষ্টকর পরিণতি দান করেন যার ফলে দুনিয়াবাসী শিক্ষালাভ করে, এসবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিজের জায়গায় বসে যতই অহংকারে মত্ত হয়ে উঠুক না কেন আল্লাহর শক্তির শৃংখলে সে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, আল্লাহ তাকে যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

৮০. অর্থাৎ কিয়ামত যার আসার খবর দেয়া হচ্ছে।

৮১. অর্থাৎ মৃত্যুকাল থেকে কিয়ামতের এই সময় পর্যন্ত। এ দু'টি সময়ের মধ্যে দশ বিশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তারা মনে করবে তারা যেন এই মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে ঘুমিয়েছিল এবং এখন অকস্মাত একটি দুর্ঘটনা তাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে।

৮২. অর্থাৎ দুনিয়াতেও তারা এমনিই ভুল আন্দাজ–অনুমান করতো। সেখানেও সত্য অনুধাবন করতে পারতো না। এ জন্যই বলে বেড়াতো, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না, মরার পরে আর কোন জীবন নেই এবং কোন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না।

৮৩. এর অন্য অনুবাদ এও হতে পারে যে, "তাদের কাছে চাওয়া হবে না যে, তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করো" কারণ তাওবা, ঈমান ও সৎকাজের দিকে ফিরে আসার সকল সুযোগই তারা হারিয়ে বসবে এবং পরীক্ষার সময় পার হয়ে গিয়ে এখনি ফল প্রকাশের সময় সমাগত হবে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। তুমি যে কোন নিদর্শনই আনো না কেন, অবিশ্বাসীরা একথাই বলবে, তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী। এভাবে যারা জ্ঞানহীন তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। কাজেই (হে নবী!) সবর করো, অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য[৮৪] এবং যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে।[৮৫]

৮৪. ওপরে ৪৭ আয়াতে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে মহান আল্লাহ নিজের এ নিয়ম বর্ণনা করেছেন যে, যারাই আল্লাহর রসূলদের নিয়ে আসা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শনের মোকাবিলা করেছে মিথ্যাচার, হাসি–তামাশা ও হঠকারিতার মাধ্যমে, আল্লাহ অবশ্যই এ ধরনের অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا আর আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্য করবেন এটা তার ওপর মু'মিনদের অধিকার وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ।

৮৫. অর্থাৎ শত্রুরা যেন তোমাদের এতই দুর্বল না পায় যে, তাদের হৈ চৈ ও শোরগোলে তোমরা দমিত হবে অথবা তাদের মিথ্যাচার ও দোষারোপ করার অভিযান দেখে তোমরা ভীত হয়ে যাও কিংবা হাসি–তামাশা ও ঠাট্টা–বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ হয়ে তোমরা হিম্মত হারিয়ে ফেলো অথবা তাদের হুমকি–ধমকি ও শক্তি প্রকাশে এবং জুলুম নির্যাতনে তোমরা ভীত হয়ে যাও কিংবা তাদের ফেলা লালসার টোপে তোমরা আটকা পড়ে যাও অথবা জাতীয় স্বার্থের নামে তারা তোমাদের কাছে যে আবেদন জানাচ্ছে তার ভিত্তিতে তোমরা তাদের সাথে সমঝোতা করে নিতে উদ্যত হও। এর পরিবর্তে তারা তোমাকে নিজেদের উদ্দেশ্য সচেতনতায় এত বেশী সতর্ক এবং নিজেদের বিশ্বাস ও ঈমানে এত বেশী পাকাপোক্ত এবং এ সংকল্পে এত বেশী দৃঢ়চেতা এবং নিজেদের চরিত্রে এতবেশী মজবুত পাবে যে, কোন ভয়ে তোমাদের ভীত করা যাবে না, কোন মূল্যে তোমাদের কেনা যাবে না, কোন প্রতারণা জালে তোমাদের আবদ্ধ করা যাবে না, কোন ক্ষতি, কষ্ট বা বিপদে ফেলে তোমাদেরকে পথ থেকে সরানো যাবে না এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকার আপোষ বা লেনদেনের কারবারও তোমাদের সাথে করা যেতে পারে না। "অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে"— আল্লাহর এ ছোট্ট একটি বাণীর আলংকারিক বাক–বিন্যাসের মধ্যেই এ সমস্ত বিষয়বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে যেমন শক্তিশালী ও গুরুত্ববহ দেখতে চাচ্ছিলেন তিনি ঠিক তেমনটি হতে পেরেছিলেন কিনা এখন ইতিহাসই তা প্রমাণ করবে। তাঁর সাথে যে ব্যক্তিই যে ময়দানে শক্তি পরীক্ষা করেছে সেই ময়দানেই সে হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত এ মহান ব্যক্তিত্ব এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেন যার পথরোধ করার জন্য আরবের কাফের ও মুশরিক সমাজ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ ও সমস্ত কলা-কৌশল প্রয়োগ করেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে।